১ | ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(১) ভারতীয় আর্যভাষা : সংজ্ঞা

পণ্ডিতদের অনুমান, খ্রীষ্টজন্মের ১৫০০ বছর আগেই আর্যভাষা-ভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। ভারতে এসে এরা যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় 'ভারতীয় আর্যভাষা'।

(২) ভারতীয় আর্যভাষার শ্রেণীবিভাগ

ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্য	মধ্যভারতীয় আর্য	নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্য
(১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)	(৬০০ খ্রীঃ পূ—৯০০ খ্রীঃ)	(৯০০ খ্রীঃ—আজপর্যন্ত)
(বৈদিক সংস্কৃত ভাষা)	(পালি - প্রাকৃত)	(বাংলা - হিন্দি - মারাঠী - পাঞ্জাবী প্রভৃতি)
(প্রাঃ ভাঃ আঃ)	(মঃ ভাঃ আঃ)	(আঃ ভাঃ আঃ)
(OIA)	(MIA)	(NIA)

আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে যে-ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম 'ভারতীয় আর্যভাষা'। তাদের আগমনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে ভারতে সেই 'ভারতীয় আর্যভাষা' নানা রূপের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসকে লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে ভাগ করা হয় :

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan = সংক্ষেপে OIA)
২. মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)
৩. নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)।

(৩) এক। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা

পণ্ডিতদের অনুমান, আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে- ভাষা ব্যবহার করেছিল, তার নাম 'ভারতীয় আর্যভাষা'। মুখের ভাষা কালে কালে পাল্টে যায়, সেই পাল্টানোর নানা

লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানা যুগের সাহিত্যে সেই পাল্টে যাওয়া ভাষার প্রমাণ আছে। ভারতীয় আর্যভাষাও ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত প্রধান তিনটি স্তরে বিবর্তিত হয়েছে—আদিস্তর, মধ্যস্তর ও অন্ত্যস্তর। ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাষায়, সেই তিনটি স্তরের নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য', 'মধ্যভারতীয় আর্য' ও 'নব্যভারতীয় আর্য'। সুতরাং আর্যরা ভারতে আসার দিন থেকে প্রথমস্তরে বা প্রথমযুগে যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা'।

❐ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল

পণ্ডিতদের অনুমান, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল হলো ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

❐ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন = ঋক্‌বেদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান নিদর্শন হলো 'বেদ'। তবে, বেদের সবটা বা চারটি ভাগই (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) নয়—তার প্রথম ভাগ 'ঋক্‌বেদ সংহিতা'ই হলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বাধিক প্রামাণ্য নিদর্শন।

❐ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা সাধারণ লক্ষণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সুদীর্ঘকাল ধরে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ—৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ভাষায় 'ঋক্' বেদের মতো একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই ভাষার মধ্যে নানা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন। তা থেকেই এই ভাষার স্বরূপটি নির্ণীত হলো :

❐ এক ❐ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। (বেদের পরবর্তী যুগে ছিল না, বা লোপ পেয়েছিল)
২. এই ভাষায় শ, ষ, স, ঃ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল।
(বেদের পরবর্তীযুগে এগুলি ছিল না বা লোপ পেয়েছিল)
৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদি স্থান ছাড়া অন্যত্র বিবিধ যুক্ত-ব্যঞ্জনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন :— ত্ত, ক্ত, ক্ষ, ক্ষ্ম, হ্ব, দ্ধ, ষ্ট্র, ক্ম, র্ম, জ্ঞ প্রভৃতি।
(বেদের পরবর্তীকালে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার সমীকৃত হয়েছে— আরো পরে নব্য-ভারতীয়-আর্যে তা একক ব্যঞ্জনে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন— প্রা-ভা-আ কর্ম > ম-ভা-আ কম্ম > ন-ভা-আ কাম (কাজ)।
৪. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় যত্রতত্র সন্ধি লেগেই ছিল।
৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এক বিশেষ শ্রেণীর স্বরাঘাত (Pitch accent) বর্তমান ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই স্বরাঘাত দেবার প্রবণতাটি ছিল তিন রকম—'উচ্চ' বা 'উদাত্ত', 'নিম্ন' বা অনুদাত্ত এবং 'মধ্যম' বা 'স্বরিত'। একটি শব্দের অন্তর্গত যে-কোনো অক্ষরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করা যেতো। অর্থাৎ শব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধ্বনিতে বক্তার ইচ্ছানুসারে এই জোর বা স্বরাঘাত পড়তো। তাতে একটা অসুবিধাও ঘটতো। শব্দের প্রথম ধ্বনিতে জোর দিলে শব্দের যে মানে হতো, দ্বিতীয় ধ্বনিতে জোর দিলে সে-মানে আর থাকতো না,— মানে পাল্টে যেতো। ভাষাতাত্ত্বিক তার উদাহরণ দিয়েছেন—'রাজপুত্র' শব্দটি। এতে 'রা'-এ জোর বা স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র =) মানে

হয়— রাজা যার পুত্র (= রাজার বাবা)। কিন্তু 'র' তে জোর দিলে (রাজপুত্র —) মানে হয়— রাজার পুত্র (রাজার ছেলে)। (দ্রঃ Macdonell— A Vedic Grammar for Students, (1971), P. 455)। তেমনি— মাতৃ (= পরিমাপকারী), মাতৃ (= মা)।

অনুরূপে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের স্বরধ্বনিগুলিরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

৬. এই গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণ তখনকার ভাষায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেমন—

'যাজ্' ধাতুর তিনটি রূপ— যজ্ঞ, যাগ, ইষ্ট।

'স্বপ্' ধাতুর তিনটি রূপ— স্বপ্ন, স্বাপ, সুপ্ত।

— এগুলিতে স্বরধ্বনিগুলির গুণ, বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্গে একটি করে আনুনাসিক ধ্বনি আছে। যেমন— 'ক' বর্গে ঙ, 'চ' বর্গে ঞ, 'ট' বর্গে ণ, 'ত' বর্গে ন এবং 'প' বর্গে ম। এবং প্রতিটি ধ্বনিরই বিশিষ্ট উচ্চারণ পার্থক্যও ছিল।

□ দুই □ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল ৫টি :

লট — বর্তমান

লৃট — ভবিষ্যৎ

লঙ, লুঙ, লিট — অতীত

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ার ভাব (Mood) ছিল পাঁচটি :

লেট — অভিপ্রায়

লোট — অনুজ্ঞা

বিধিলিঙ্গ — নির্বন্ধ, নির্দেশক ও সম্ভাবক।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বচন ছিল ৩টি :

একবচন দ্বিবচন বহুবচন

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুরুষ ছিল ৩টি :

উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ

— বচনভেদে প্রত্যেকটি পুরুষে ক্রিয়ার পার্থক্য ঘটতো।

৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ ছিল ৩টি :

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ

—তখন লিঙ্গ নির্ভর করতো ব্যাকরণ নির্দিষ্ট পথে। যেমন— 'নদী' বা 'লতা' এখনকার ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে সেগুলি ছিল স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণে তাই কোন শব্দ কী লিঙ্গ হবে, তা নির্দিষ্ট হয়েছে। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে লিঙ্গ ছিল নির্দিষ্ট ব্যাকরণ সম্মত।

৬। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কারক ছিল ৮টি :

কর্তৃ কর্ম করণ সম্প্রদান

অপাদান অধিকরণ সম্বন্ধপদ সম্বোধনপদ।

৭। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়া বিভক্তির রূপ ছিল ২টি :

আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ।

৮। এই ভাষায় বাচ্য ছিল—২টি : কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য।

৯। এই ভাষার প্রত্যয় ছিল— ২টি : কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।
[illegible]

১০। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে উপসর্গ ছিল — [illegible]
[illegible]

১১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রচুর অনুসর্গ [illegible]
[illegible]

১২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বাক্যগঠনে পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। তবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বিভক্তি চিহ্ন ছিল সুনির্দিষ্ট, [illegible] বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের চিনে নিতে [illegible] বাক্যের অর্থ ভেঙে পড়তো না। যেমন : [illegible] ঠিক। তেমনি— [illegible] ঠিক।

১৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্য—বৈদিকে একাধিক পদে সমাস হতো না, [illegible] দুই পদে সমাস হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কৃতে সমাসের [illegible]

১৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক—অর্থাৎ অক্ষর গুনে গুনে এবং অক্ষরের লঘু গুরু মেনে মাত্রা নির্ণীত হতো। এতে সুর বা তানের প্রাধান্য ছিল। শেষদিকে ছন্দ হয়েছিল মাত্রামূলক।।

(৩) দুই। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

□ সংজ্ঞা ও স্থিতিকাল

ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা'। পণ্ডিতদের মতে এর স্থিতিকাল—৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।[1]

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাগত নাম 'প্রাকৃতভাষা'। প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র বলেন— 'প্রাকৃত' এসেছে 'প্রকৃতি' থেকে। প্রকৃতি মানে মূলবস্তু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার মূলবস্তু হলো—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত। আর তার থেকেই জন্মেছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। তাই 'প্রকৃতি' থেকে জন্মেছে বলেই দ্বিতীয় স্তরের ভাষার নাম 'প্রাকৃত'।[2]

□ যুগবিভাগ, স্থিতিকাল, নিদর্শন ও ভাষা-নাম

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট উপস্তর লক্ষ করেছেন পণ্ডিতেরা। সেগুলি হলো :

১ সুকুমার সেনের মতে স্থিতিকাল—খ্রীষ্টপূর্ব [illegible]
২ 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্' — হেমচন্দ্র

(ক) প্রথম উপস্তর
- ☐ স্থিতিকাল = খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ— খ্রীঃ ১ম
- ☐ নিদর্শন = নানা অনুশাসন
- ☐ ভাষা-নাম = (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-মধ্য-প্রাচ্য) প্রাকৃত

(খ) দ্বিতীয় উপস্তর
- ☐ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ১ম—৬ষ্ঠ
- ☐ নিদর্শন = সংস্কৃত নাটকের নারী ও ভৃত্যের সংলাপ
  = জৈন সাহিত্য
  = নানা প্রাকৃতে অপভ্রংশ অপভ্রষ্টে লেখা— কিছু মহাকাব্য—নাট্যকাব্য— গীতিকাব্য— ছন্দঃশাস্ত্র—ব্যাকরণ প্রভৃতি।
- ☐ ভাষা-নাম = মাগধীপ্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

(গ) তৃতীয় উপস্তর
- ☐ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ৬ষ্ঠ—৯ম
- ☐ নিদর্শন = অপভ্রংশে লেখা—মহাকাব্য, কথানক, গীতিকাব্য, সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সংলাপ।
- ☐ ভাষানাম = মাগধী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, পৈশাচী অপভ্রংশ, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ।

☐ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা আসলে আঞ্চলিক উপভাষার মতো। স্থানে স্থানে তার স্থানীয় নাম। অশোকের অনুশাসনগুলিতে 'উত্তর-পশ্চিমা', 'দক্ষিণ-পশ্চিমা,' প্রাচ্য-মধ্যা' ও 'প্রাচ্যা'—এই চার রকমের 'আঞ্চলিক প্রাকৃতে'র সন্ধান মেলে। 'সুতনুকা' প্রত্নলেখ তার একটি উদাহরণ। তেমনি প্রচলিত প্রাকৃতগুলির নাম 'মাগধী', 'শৌরসেনী', 'মাহারাষ্ট্রী', 'পৈশাচী' ও 'অর্ধমাগধী'। আবার এই পাঁচ নামেই অপভ্রংশ প্রচলিত। পণ্ডিতেরা এগুলির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। আবার এগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলেছেন। তাঁদের সেই নির্দেশ মেনেই আমরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করছি :

☐ এক।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ☐

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

২. ঌ, দীর্ঘ ঌ, ৠ-কার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

৩. ঋ-কার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে— কখনো 'ঋ' হয়েছে 'অ', 'ই', 'উ', 'এ'— কখনো ঋ হয়েছে 'র', 'রি', 'রু', যেমন :

ঋ > অ— মৃগ > মগ। তৃণ > তণ	ঋ > এ— বৃন্ত > বেন্ট
ঋ > ই— মৃগ > মিগ। হৃদয় > হিঅঅ	ঋ > র— বৃক্ষ > রুক্ষ
ঋ > উ— মৃগ > মুগ। ঋজু > উজু	ঋ > রি— ঋষি > রিসি

৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ঐ-কার 'এ'-কারে এবং ঔ-কার 'ও'-কারে পরিণত হয়েছে।

যেমন :
ঐ > এ— বৈদ্য > বেজ্জ, তৈল > তেল্ল, তেল, মৌক্তিক > মোত্তিঅ।
ঔ > ও— কৌমুদী > কোমুই, ঔষধ > ওসধ, গৌরী > গোরী।

৫. যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী আ, ঈ, ঊ— ধ্বনির হ্রস্বতা।
আ > অ— কাব্য > কব্ব। কান্ত > কন্ত। কার্য > কজ্জ।
ঈ > ই— কীর্তি > কিত্তি। তীক্ষ্ণ > তিকখ।
ঊ > উ— মুহূর্ত > মুহুত্ত। মূল্য > মুল্ল।

৬. যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন :
অ > আ— অশ্ব > আস, স্পর্শ > ফাস।
ই > ঈ— শিষ্য > সীস, বিশ্রাম > বীসাম।
উ > ঊ— দুর্লভ > দূলহ, দুঃসহ > দূসহ।

৭. পদান্তস্থিত অনুস্বারের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। যেমন :
পাংশু > পংসু। কান্তাং > কন্তং।

৮. পদমধ্যস্থ অনুস্বার লোপ পেলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে যেমন :
বিংশতি > বীসা। ত্রিংশত > তীসা।

৯. 'অয়' এবং 'অব' যথাক্রমে 'এ' এবং ও-কারে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন :
অয় > এ— কথয়তু > কথেতু। পূজয়তি > পুজ্জেতি, পুজ্জেই।
অব > ও— লবণ > লোণ। ভবতি > ভোদি।

১০. তবে, পদের শেষে যুক্তব্যঞ্জন না-থাকলে অনুস্বার রক্ষিত হয়েছে। যেমন :
নরম (নরং) > নরং।

১১. পদান্তস্থিত বিসর্গ কখনো 'এ' বা 'ও' হয়েছে। কখনো লোপ পেয়েছে।
যেমন:
ঃ > এ— জনঃ > জনে
ঃ > ও— জনঃ > জনো
ঃ > লোপ— জনঃ > জন, মুনিঃ > মুনি

১২. পদান্তস্থিত 'ম' বা 'ন' থেকে জাত অনুস্বার ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। যেমন :
নরান > নরা। পুত্রাৎ > পুত্তা।

১৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় 'শ', 'ষ', 'স'— এই তিনটি শিসধ্বনির নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে—
(ক) মাগধী প্রাকৃতে 'শ' আছে, অন্য দুটি নেই। যেমন :
সুতনুকা > শুতনুকা (শুতনুক নম দেবদশিক্যি)।
(খ) অন্যান্য প্রাকৃত গুলিতে 'স' আছে। অন্য দুটি নেই। যেমন :
দ্বাদশ > দুবাদস। তিষ্ঠন্ত > তিসঠন্তো।

১৪. মধ্যভারতীয় আর্যে দন্ত্যবর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ধণ্য বর্ণে (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পরিণত হয়েছে। কখনো বা দন্ত্যবর্ণ গুলি ঋ, র, ল, ষ যোগে 'ণ' বর্ণে পরিণত হয়েছে । যেমন :
বিকৃত > বিকট। দ্বাদশ > দুবাডস।

১৫. পদের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জন কখনো একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, কখনো বিশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন :-

ব্রাহ্মণ > বম্ভন। খ্রীনি > তিন্নি।

১৬. পদের মধ্যস্থিত বা অন্ত্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন :

মধ্যস্থিত = কল্যাণম > কল্লাণং।

অন্ত্যস্থিত = ভক্ত > ভত্ত।

১৭. কখনো কখনো (দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরে) পদমধ্যস্থিত একক ব্যঞ্জন—

(ক) অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে। যেমন :

শোক > শোঅ

(খ) মহাপ্রাণ হলে 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :

শেফালিকা > সেহালিআ।

১৮. অনেকসময় অঘোষধ্বনি সঘোষ হয়েছে। যেমন :

নীপা > নীব, শকট > সগড, ঋতু > উদু কলাপ > কলাব।

দুই ।। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক বোঝাতে একবচন এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

একবচন > বহুবচন

পুজো > পুজ। পঙ্গ > পই, পঙ্গিউ, পঙ্গিও।

২। লিঙ্গ বিধি : মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনলোপের জন্যে প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভেদ নাই। যেমন :-

ফলানি > ফলা নরান্ > নরা

৩। ধাতুরূপে আত্মনেপদের লোপ। সর্বত্রই পরস্মৈপদের ব্যবহার।

৪। শব্দরূপে চতুর্থী বিভক্তির লোপ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সাদৃশ্যনীতির প্রয়োগ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সরলতা— এযুগের ভাষার প্রধান উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

৫। মধ্যভারতীয় আর্যে দশটি গণের মধ্যে একমাত্র ভ্বাদি গণই বর্তমান আছে (অন্য নটি গণ লোপ পেয়েছে)।

৬। এযুগের ভাষায় ক্রিয়ার কালের রূপ গুলি হলো নিম্নরূপ :

বর্তমান কাল— নির্দেশক (লট্), অনুজ্ঞা (লোট), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্)।

অতীত কাল— লিট-এর লোপ; লঙ ও লুঙের একাত্মীকরণ।

ভবিষ্যৎ কাল— লৃট—ছাড়া অন্যগুলির যোগ।

৭। এযুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে।

আবার নিষ্ঠান্ত (ক্ত প্রত্যয়) পদ অতীতকালের অর্থে সমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তির লোপ পেয়েছে বলে পদস্থাপন বা বাক্যগঠন রীতিতে কঠোরতা বা সংযম এসেছে।

৯। এযুগের ভাষায় অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পেয়েছে। সেজন্যে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০। এযুগের ছন্দ প্রধানত মাত্রামূলক অর্থাৎ অক্ষর উচ্চারণের কাল অনুসারে এযুগে শব্দের মাত্রা নির্ণয় করা হতো। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, চরণ প্রথম দিকে বিষমমাত্রিক ছিল— শেষদিকে তা বিষম মাত্রিকের সঙ্গে সমমাত্রিক হলো। এবং সর্বশেষে চরণান্তিক মিল প্রধান লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন :

(ক) মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত

কইঅব-রহিঅং পেম্মং নখি ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ

অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জিঅই।

[অনুবাদ : হে সখি ছলনাহীন প্রেম মানুষের পৃথিবীতে হয় না। যদি তা হতো তবে কার আর বিরহ থাকতো। বিরহ হলে কেই বা বাঁচতো।]

(খ) অপভ্রংশ

সো মহু কন্তা, দূর দিগন্তা

পাউস আএ, চেলু দুলাএ।

[অনুবাদ : আমার প্রিয় দূর দিগন্তে (গেছে)। বর্ষা আসে, আমার বস্ত্রাঞ্চল দুলছে।]

(৩) তিন। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(New Indo-Aryan and its Linguistic Features)

ন. ভা. আ. (NIA)

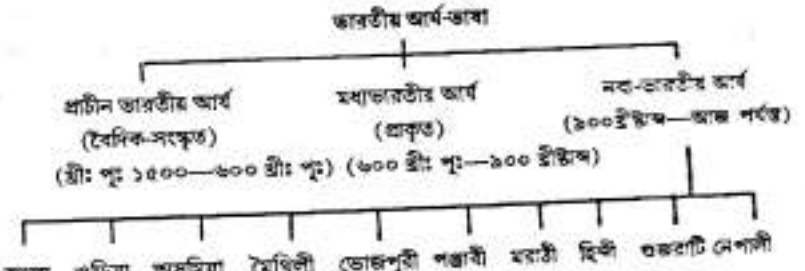

❐ সংজ্ঞা

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে জাত, যে সব আঞ্চলিক ভাষা সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভূত হয়েছিল এবং আজও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাদের নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলে। যেমন : বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, মরাঠী, হিন্দি, গুজরাটি, নেপালী, বাঘেলী প্রভৃতি।

সংজ্ঞা-বিস্তৃতি

সুতরাং নব্যভারতীয় আর্যভাষার

(ক) জন্ম / উৎস— মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষা অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ থেকে।

(খ) জন্ম / উদ্ভব কাল—(আনুমানিক) খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

(গ) নিদর্শন ও ভৌগোলিক বর্গীকরণ—আজকে অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলিই হলো নব্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক বা স্থানীয় নাম।

প্রচলিত অঞ্চল-নাম অনুসারে পণ্ডিতেরা এগুলির নাম দিয়েছেন :

(ক) প্রাচ্যখণ্ডে প্রচলিত— বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী।
(খ) প্রাচ্য-মধ্যখণ্ডে প্রচলিত— বাঘেলী, ছত্রিশগড়ী।
(গ) উত্তর (হিমালয়) অংশে প্রচলিত— নেপালী, গাড়োয়ালী, গোর্খালী।
(ঘ) উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচলিত— সিন্ধী, পাঞ্জাবী।
(ঙ) মধ্যদেশে প্রচলিত— হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটি।
(চ) দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত— মরাঠী, কোঙ্কনী।

— এই যে প্রচলিত অঞ্চল বা স্থান অনুসারে ভাষাসম্প্রদায়গুলির ভৌগোলিক জরিপ, তাকেই বলে 'ভৌগোলিক বর্গীকরণ'।

☐ নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ☐

'নব্যভারতীয় আর্যভাষা'— একটি নয়, অনেকগুলি। তামাম ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলে সেগুলির এক এক নাম। যেমন— বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, ভোজপুরী, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি। এগুলির উৎস সাধারণ বিচারে অবশ্যই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা— প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। আর জন্ম উৎস এক বলেই, এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত অনেক সাধারণ মিল বা লক্ষণ বর্তমান। অঞ্চল বিশেষে দীর্ঘদিন প্রচলিত বলেই, এদের নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। আমরা সেই 'নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য'টুকু বাদ দিয়ে এদের ভাষাতত্ত্বগত সাধারণ লক্ষণগুলিই এখানে আলোচনা করছি :

এক ।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন :

সং মিহির > ন. ভা. আ. (বাংলা) মিহির্। রাম > রাম্।
সং জল্ > জল্। গৌরব > গৌরব্। প্রদীপ > প্রদীপ্।

২. পদমধ্যস্থ দ্বিস্বরধ্বনির (ইঅ, ঈআ, উঅ, ঊআ) শেষটি 'অ' অথবা 'আ' হলে— তা লুপ্ত হয়েছে। যেমন :

মৃত্তিকা > মট্টিআ > মাটি।

৩. কখনো কখনো পদমধ্যস্থিত 'ইঅ' বা 'উঅ' যথাক্রমে 'ঈ' বা 'ঊ' হয়েছে। যেমন : ঘৃত > ঘিঅ > ঘী।

৪. পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘস্বর হয়েছে। যেমন :

কার্য > কজ্জ > কাজ। ধর্ম > ধম্ম > ধাম। নৃত্য > নচ্চ > নাচ।
হস্ত > হত্থ > হাত। তঙ্ক > টঙ্কা > টাকা। পক্ব > পক্ক > পাক।

৫. যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি নাসিক্য ধ্বনি হলে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম), সেটি ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে। যেমন :

সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ। অঞ্চল > অচ্চল > আঁচল।
সন্তার > সংতার > সাঁতার। নিম্বু > নিংবু > নেবু।
কণ্টক > কণ্টঅ > কাঁট (কাঁটা)। চণ্ডাল > চংডাল > চাঁড়াল।

৬. দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন থাকলে, তার সংশ্লিষ্ট স্বরটির নানা পরিণতি ঘটে :

(ক) কখনো উদ্বৃত্ত স্বরটি লোপ পায়—
ঘৃত (ঘ্ + ঋ + ত্ + অ (উদ্বৃত্তস্বর) > ঘিঅ > ঘী।

(খ) কখনো পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উদ্বৃত্ত স্বরটির সন্ধি হয়—
গত + ইল্ল > গেল [গত > গঅ, গঅ। গঅ + ইল (< ইল্ল)]

(গ) কখনো উদ্বৃত্ত স্বরটি পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বর হয়—
অ + উ = ঔ— বধূ > বউ > বৌ (ব্ + অ + ধ + উ > ব্ + অ + উ)
— মধু > মউ > মৌ।

৭. নব্যভারতীয় আর্যে বহু বিদেশী ভাষার শব্দ ঢুকেছে। সেই সব বিদেশী শব্দের প্রভাবে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

ক — কলেজ জ — জর্জ
খ গ য

।। দুই ।। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। **লিঙ্গ :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীনভারতীয় আর্যের লিঙ্গবিধি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি। (১) মরাঠী ও গুজরাটি ভিন্ন অন্য সব ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। (২) সিংহলীতে 'সপ্রাণ' ও 'অপ্রাণ' নামের নতুন দুটি লিঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে। (৩) অনেকগুলি নব্যভারতীয় আর্যে শব্দের অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণীত হয়েছে। (এবং সংস্কৃতের নিয়ম মানা হয় নি) যেমন :— সংস্কৃতে 'লতা' বা 'নদী' স্ত্রী লিঙ্গ; নব্যভারতীয় আর্যের বাংলায় 'লতা' বা 'নদী' ক্লীবলিঙ্গ। (৪) বাংলায় সর্বনামে লিঙ্গ ভেদ উঠে গেছে। যেমন :— নারী বা পুরুষ— উভয়েই বলে— 'আমি' ব্যাকরণ পড়ি। নারী বা পুরুষ— উভয়দলকে দেখিয়েই বলি—'তোরা যা'।

২। **বচন :** নব্যভারতীয় আর্যে বচন দু রকম— একবচন, বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতের মতো এখানে দু রকম বচনের রূপভেদ নেই। এখন বহুবচন হলো— (ক) বহুত্ববাচক পৃথক শব্দ (সব, সকল, দল, সমস্ত, গুলি) দিয়ে গঠিত অথবা

(খ) ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষয়িত রূপ (রা, এরা, এদের) দিয়ে গঠিত। যেমন—

একবচন > বহুবচন
লোক লোকগুলি, সমস্ত লোক, লোকেরা, লোকদের।

তবে হিন্দি মরাঠী সিন্ধীতে একবচন ও বহুবচনের পৃথকরূপও আছে—
হিন্দি = লড়কা—লড়কে।

৩। **কারক :** নব্যভারতীয় আর্যে কারক প্রধানত দুটি—
মুখ্য কারক — কর্তা

তির্যক/গৌণ কারক — করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ (কর্মকারক আগেই কর্তা কারকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।)

৪। **বিভক্তি :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন বিভক্তি গুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। (মাত্র দু একটি প্রাচীন বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ বর্তমান আছে)। আর লোপপাওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্য নতুন নতুন প্রত্যয়, প্রত্যয়গত শব্দ ও অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

বাংলায়— র, এর, আগে, কে। বাংলার লোক; ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার; তোমার আগে কহিল নিশ্চয়; জলকে চল্।

হিন্দিতে— সে (< সম), কো(কৃত)— ঘর সে (ঘর থেকে), রামকো (রামকে)।

৫। **ক্রিয়ার কাল ও ভাব :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মতো ক্রিয়ার পাঁচভাব ও পাঁচকাল নেই।

এখানে (ক) বর্তমান কাল নির্মিত হয়েছে কর্তৃবাচ্যে ও কর্মভাববাচ্যে।

(খ) অতীত কালের ক্রিয়াপদ সর্বত্রই ধ্বনিপরিবর্তন সাপেক্ষে 'ক্ত' প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত।

(গ) ভবিষ্যৎ কালের পদ নিষ্পন্ন হয়েছে 'তব্য' অথবা 'শতৃ' প্রত্যয় যোগে। তবে পশ্চিম পঞ্জাবী ও গুজরাটিতে ভবিষ্যৎ-কালের প্রাচীন রূপ বর্তমান আছে।

৬। **যৌগিক কাল :** নব্যভারতীয় আর্যে মধ্যস্তর থেকে একাধিক ধাতু মিশে যৌগিক কালের রূপ গঠিত হয়েছে। যেমন :

গত + √ ভূ (√ অস্) > গয়া হৈ (হিন্দী)।

গত + √ অস্ (< আছে) > গিয়াছে (বাংলা)।

৭। **শ্রুতিধ্বনি :** নব্যভারতীয় আর্যে য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির প্রচলন ঘটেছে। যেমন :

য়-শ্রুতি— দু-এক = দুয়েক, বাবুআনি = বাবুয়ানি।

ব-শ্রুতি— যো আ = যোয়া, (যোওয়া), শো আ > (শোওয়া)।

এর ফলে উচ্চারণ সৌকর্য বেড়েছে।

৮। **বিদেশী শব্দ গ্রহণ :** নব্যভারতীয় আর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদেশী শব্দ গ্রহণ।— আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ তো ছিলই, তার সঙ্গে মিশলো প্রচুর ইংরেজী শব্দ। এইভাবেই নব্যভারতীয় আর্যের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলো।

৯। **বাক্যগঠন :** নব্যভারতীয় আর্যে বাক্যগঠনের বিচিত্র পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশী রইলো না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পদ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্তি চিহ্ন বসতো। নব্যভারতীয় আর্যে বিভক্তি বিধি অনেক শিথিল হলো। অনেক সময় বিভক্তি বসলো না। ফলে কোনো বাক্যের কর্তা কর্ম নির্ণয়ে এখন জটিলতা সৃষ্টি হলো। শুধু বিভক্তি দিয়ে কর্তা কর্ম চেনা গেলো না।

১০। **ছন্দ বৈচিত্র্য :** নব্যভারতীয় আর্যে ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে উঠলো। অন্ত্যানুপ্রাস এলো। পর্বে পর্বে, পদে পদে মিল এলো। ছন্দে মাত্রাবৃত্ত রীতি জাঁকিয়ে বসলো। 'গদ্য-ছন্দ' এলো। তা এসে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দকে স্তব্ধ করে দিলো। বাংলায় স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত—তিন রীতির ছন্দ। অমিত্রাক্ষর, গদ্যকবিতার ছন্দ, সনেট প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ দেখাগেলো।

□ নব্যভারতীয় আর্যভাষার নমুনা □

(১) বাংলা : (ক) ১০ম-১২শ শতকের বাংলা :

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।— চর্যাপদ

(খ) ১৫শ শতকের বাংলা :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

(গ) ১৮শ শতকের বাংলা :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।। —(অন্নদামঙ্গল) ভারতচন্দ্র

(ঘ) ২০শ শতকের বাংলা :

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে,
সেদিন আমার বুকেরও এরকম আতরের গন্ধ হবে। — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(২) ওড়িয়া :

রাত্তির দুইপহর অন্ধার থিলা। চিতোরের সবু লোক গাঢ় নিদরে শুইথিলে। রাজপুরী নির্জন থিলা। এহি সময়রে মীরা নগরক বিদায় নেলা। কেহি তাকু বাধা দেলে নাহিঁ। রাস্তারে কেতিয়ে নই পড়িলা। মীরা সেথিরে ডেঁই পড়লা।

(৩) মৈথিলী :

পত্র পড়ল। পঢ়িত কাল আঁখি সঁ নীরক ধার বহিল। পত্রক অন্ত হোইত সুখাইও গেল। চারু কাত ঘুরি কএ দেখল কেও অছি ত নে। সংযোগমে কেও ছল নহি।

(৪) মগহী :

আধা রাতকে কুচকুচ অন্ধেরিয়া হল। চিটৌড় কে জেতনা লোগ হলন সব নিন্দ মে বেহোস হলন। রাজপুরী মে সানাটা হল। অইসন বখত মীরা উ সহর সে রওয়ানা হো গেল। কেই রুকরা রোকলোক নহী।

(৫) ভোজপুরী :

নউআ ওঁহ খেতে মে গোঁহু বোঅলেস। উ গোঁহু জব পাকে সুরু ভইল তব উহে চোর কাটে বদে এলন। তব উ বীচ খেতে মে খাটিয়া লো জাকে সুতল।।

২ | বাংলা ভাষার স্তরবিভাগ। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

□ ভূমিকা : বাংলা ভাষার ইতিহাস

১। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

২। বাংলা ভাষার উৎস বা উৎপত্তিস্থল হলো 'মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ', কারো কারো মতে 'আদর্শ কথ্য প্রাকৃত'। (এবং 'সংস্কৃত থেকে নয়)

৩। বাংলা ভাষার এখন বয়স প্রায় এক হাজার বছর— ৯০০ খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত। এই একহাজার বছরে বাংলাভাষা নানাবিবর্তনের মধ্যদিয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

৪। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলাভাষার এই হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি স্তরে বা যুগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলি হলো :

এক॥ 'প্রাচীন' বা 'আদি' বাংলা, কালসীমা ৯০০-১৩৫০ খ্রীঃ।

দুই॥ মধ্য বাংলা— তার দুইভাগ

(ক) 'আদি-মধ্য'বাংলা, ১৩৫১-১৫০০ খ্রীঃ,

(খ) 'অন্ত্যমধ্য' বাংলা, ১৫০১-১৭৬০ খ্রীঃ।

তিন॥ আধুনিক বাংলা, কালসীমা ১৭৬১ খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত।

□ এক □ 'প্রাচীন বাংলা' (= আদি স্তর) ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্ট লক্ষণ। (Linguistic Features of old Bengali Language)

চর্যাপদের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) কালসীমা :

প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হলো আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। কেউ কেউ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কেও এই প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ সীমা বলে মনে করেন।

(২) প্রাচীন বাংলার নিদর্শন : 'চর্যাপদ'

প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বৌদ্ধসহজ সাধকদের লেখা 'চর্যাগীতি পদাবলী' বা 'চর্যাপদ'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এটি আবিষ্কার করেন। নাম দেন— 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থে তিনি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' প্রকাশ করেন। এগুলি যে বাংলা ভাষায় লেখা, তা প্রমাণ করেন ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[এছাড়া আরো কিছু গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা শব্দের বা ২ একটি বাংলা ছড়ার নিদর্শন আছে। এগুলি হলো—
(ক) বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের— 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'
(খ) বন্দ্যঘটী সর্বানন্দের অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব'
(গ) 'সেকশুভোদয়া']

(৩) প্রাচীন বাংলাভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(এক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পূর্বস্তরের যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক-ব্যঞ্জনে পরিণতি এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্ব-স্বরের দীর্ঘীকরণ।
সংস্কৃতে যা ছিলো যুক্তব্যঞ্জন ('কার্য'), প্রাকৃতে তা-ই হলো যুগ্ম ব্যঞ্জন (কজ্জ), বাংলা ভাষার আদিস্তর চর্যাপদে তা-ই হয়েছে একক ব্যঞ্জন (কাজ)— আর ক্ষতিপূরণ বা পরিপূরক হিসেবে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরটি দীর্ঘস্বর হয়েছে। তাই কজ্জ > 'কজ্জ' না হয়ে হয়েছে কাজ। তেমনি : জন্ম > জম্ম > জাম।
অবশ্য এর অনেক ব্যতিক্রমও আছে।

২. প্রাচীন বাংলা চর্যাপদে পদের অন্তঃস্থিত স্বরধ্বনি বর্তমান ছিল। যেমন :
ভণতি > ভণই। পুস্তিকা > পোত্থিআ > পোথী। উত্থিত > উট্‌ঠিঅ > উঠি।

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে, কিন্তু দুটি মিলেমিশে (সন্ধি করে) একটি স্বরে পরিণত হয়নি। যেমন :
উদাস > উআস। এখানে উ, আ দুটি স্বরধ্বনি সন্ধিবদ্ধ হয়নি, পৃথক পৃথক আছে।

৪. প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে 'য়', 'ব' ধ্বনি এসে গেছে। যেমন :
'য়' আগম = নিকটে > নিঅড়ি > নিয়ড়ি।
'ব' আগম = ত্রিভুবন > তিহুঅণ > তিহুবণ। কবড়ি। আবই।

৫. প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণধ্বনি সাধারণত 'হ্‌'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :
মহাসুখ > মহাসুহ। কথন > কহন।

৬. প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন :
সকল > সঅল। সরোবর > সরোঅর।

৭. প্রাচীন বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জন ধ্বনি কখনো কখনো লোপ পেয়েছে। এবং অবলুপ্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়েছে। যেমন :
মধ্যেন > মাঝেঁ। শব্দেন > সাঁদে

৮. প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণে বা ব্যবহারে 'ন' এবং 'ণ' এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও 'ন' কোথাও 'ণ'। যেমন :
নাবী — ণাবী। নিয় — ণিব।

৯. প্রাচীন বাংলা ভাষায় শ, ষ, স— এই তিন শিস্ ধ্বনির উচ্চারণে বা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও 'শ', কোথাও 'স'; আবার কোথাও কোথাও 'স' 'ষ' হয়েছে। যেমন :
শূন — সূণ। শবরী — সবরী। মুষা — মুসা। সহজে — সহজে।

১০. প্রাচীন বাংলায় 'য' ধ্বনি উচ্চারণে বা ব্যবহারে 'জ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। তাই চর্যাপদের বানানে কোথাও 'য' নেই। যেমন :
জে জে আইলা। জো মনগোঅর। জেন। জসু।

১১. প্রাচীন বাংলায় আদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়েছে। আর তারই ফলে শব্দের আদি স্বরটি অনেকসময় দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন :

'আলো ডোম্বী'। আকট (অকট)।

(দুই) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বগত একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র' বা 'এর' ব্যবহার। এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মেলে। যেমন :

রুখের তেন্তলি। হরিণার খুর ন দীসঅ। ঢেন্ঢন পাএর গীত।

২। প্রাচীন বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়— এখনকার বাংলার মতোই। যেমন:

বলদ বিআএল। পইঠো কাল। চলিল কাহ্ন। লুই ভণই। হরিণা পিবই ন পাণী।

৩। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে ও সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি বর্তমান। এটিও শুধু বাংলাতেই পাওয়া যায়। যেমন :

তোহোরে অন্তরে। করিণা করিনিরেঁ রিসঅ।

৪। প্রাচীন বাংলায় করণকারকে 'তে', 'তেঁ ' বিভক্তি বর্তমান। এটিও বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব লক্ষণ। যেমন :

সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।

৫। প্রাচীন বাংলায় অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটিও বাংলার নিজস্ব বিভক্তি। এছাড়া অধিকরণে 'ই', 'এ', 'হিঁ', 'তেঁ' প্রভৃতি বিভক্তিও আছে। যেমন :

সাস্কমত চড়িলে। টালত ঘর মোর। মাঙ্গত চড়হিলে।

হাঁড়িত ভাত নাহি। চঞ্চল চীএ। হিঅহি ন পইসই। আমে কাম। কামে আম।

৬। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদের ভাষায় সম্বন্ধে 'র', 'এর', 'ক' বিভক্তি হয়েছে। এটিও বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন :

মোহোর বিগোআ। রুখের তেন্তলি। এড়িএউ ছান্দক বান্ধ।

৭। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ক্রিয়াই ছিল। সমাপিকা ক্রিয়ায় অতীতকাল বোঝাতে 'ইল' এবং ভবিষ্যত কাল বোঝাতে 'ইব' প্রত্যয় যুক্ত হতো। যেমন :

ইল— দেখিল, আইল, রুন্ধেলা, গেলা, ভইলা।

ইব— হোইব, জাইবেঁ, করিব।

৮। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারও প্রচুর উদাহরণ মিলে। 'ইলে' বা 'অন্তে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন :

ইলে— সাঙ্কমত চড়িলে। রাতি ভইলে।

অন্তে— জাগন্তে সুখাড়ী।

এছাড়াও নানা অসমাপিকার উদাহরণ হলো :

দিঢ়া চঞ্চালী। কণ্ঠে লইআ। কঁহি গই। দিঢ় করিঅ। আঁখি বুজিঅ। অপণে বহিআ।

৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বহুবচন পদগুলি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

সং অস্মাভিঃ > প্রা. অমহ্‌হি > অপ. অমহ্‌হি > প্রা. বাং অমহে, আম্‌হে।

এই বহুবচন পদটি একবচন 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে দিঠা।

তেমনি— তুষ্মাভিঃ (যুস্মাভিঃ) > তুম্‌হাহি > তুম্‌হহি > তুমহে।

১০। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক-ক্রিয়ার ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য। যেমন :

গুণিয়া লেহুঁ। দুহিল দুধু। দিঢ় করিঅ। উঠি গেল।

১১। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কর্ম বা ভাববাচ্যের বহুল ব্যবহার আছে। যেমন :

রাতি পোহাইলী। খুর ন দীসঅ। বাট জাইউ।

১২। প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্ব। যেমন :

উঁচা উঁচা পাবত। কেহো কোহো তোহোরে বিরুআ বোলই। জে জে আইলা তে তে গেলা।

১৩। প্রাচীন বাংলা ভাষায় যেমন সংখ্যা -বাচক বিশেষণ ছিল, তেমনি বহুত্ব-বোধক বিশেষণও ছিল। যেমন :

সংখ্যাবাচক = পঞ্চবি ডাল। বতিস জৈইনী। তিশরণ নাবী। চৌষঠ্‌ঠী কোটা।

বহুত্ববোধক = সকল সমাহিঅ। জৈইনী জাল।

১৪। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে অনেক গুলি প্রবাদ প্রবচন আছে। যেগুলিকে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করা হয়। যেমন :

(ক) অপনা মাঁসেঁ হরিণা বৈরি।	(ঘ) দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায়।
(খ) হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।	(ঙ) জো সো চৌর সোই সাধী।
(গ) জো সো বুধী সোধ নিবুধী।	(চ) বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।

(৪) নিজস্ব মন্তব্য :—

বাংলা ভাষার আদি যুগের প্রধানতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি' বা 'চর্যাপদ'। আর এই গ্রন্থেই বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এমন ভাবে গড়ে উঠেছে, যা মধ্য-স্তরের মধ্যদিয়ে আধুনিক স্তরেও আমরা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করি। ডঃ সুনীতিকুমারের পর ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ডঃ রামেশ্বর শ প্রমুখ ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা এই ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এবং তাঁদের ধারাপথে আমরা সহজে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলিকে অনুধাবন করেছি। বলাবাহুল্য, চর্যাপদেই বাংলা ভাষার ভিত্তিপ্রস্তর সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়েছে॥

□ দুই □ মধ্যবাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য/বিশিষ্ট লক্ষণ

মধ্যবাংলা
(১৩৫১-১৭৬০)

- আদি-মধ্যবাংলা (১৩৫১-১৫০০)
  - ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- অন্ত্য-মধ্যবাংলা (১৫০১-১৭৬০)
  - ১. বৈষ্ণব পদাবলী
  - ২. বৈষ্ণব জীবনী (চৈতন্য জীবনী)
  - ৩. মঙ্গল কাব্য
  - ৪. অনুবাদ কাব্য
  - ৫. মুসলমানী সাহিত্য
  - ৬. শাক্তপদাবলী

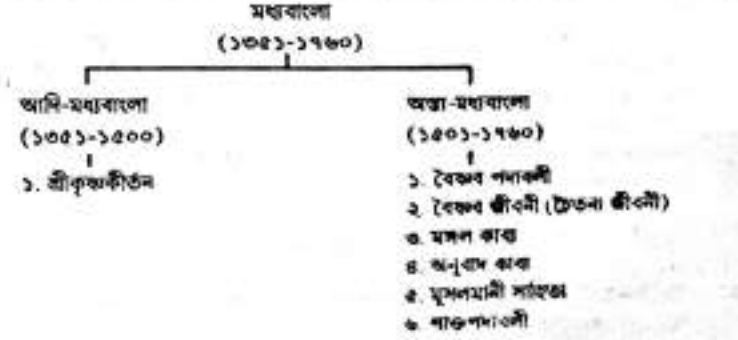

□ ভূমিকা :

পণ্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে, নানাভাবে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হচ্ছে। এই সুদীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন :

ক. 'আদিস্তর' বা 'প্রাচীন বাংলা'। নিদর্শন 'চর্যাপদ'। স্থিতি কাল ৯০০-১৩৫০ খ্রীঃ।

খ. 'মধ্যস্তর' বা 'মধ্যবাংলা'। স্থিতিকাল ১৩৫১-১৭৬০ খ্রীঃ।

গ. 'আধুনিক স্তর' বা 'আধুনিক বাংলা'। স্থিতিকাল ১৭৬১ খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত।

তন্মধ্যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়—'মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ'। পণ্ডিতদের মতে, মধ্যবাংলার কালসীমা ১৩৫১ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ। অর্থাৎ প্রায় চারশো বছর। যেহেতু ভাষা পরিবর্তনশীল এবং নদীর মতো খাত পরিবর্তনকারী, তাই সূক্ষ্ম বিচারে এই মধ্যবাংলার দুটি উপবিভাগ বা উপস্তর আছে :

(ক) 'আদিমধ্য' (স্থিতিকাল = ১৩৫১-১৫০০ খ্রীঃ)।

(খ) 'অন্ত্যমধ্য' (স্থিতিকাল = ১৫০১-১৭৬০ খ্রীঃ)।

॥ দুই (অ) ॥ 'আদি-মধ্য' বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ

(Linguistic Features of Early-Middle Bengali Language)
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য)

(১) কালসীমা :—

'আদি-মধ্য'স্তরের বাংলা ভাষার কালসীমা আনুমানিক ১৩৫১ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ।

(২) নিদর্শন :— (প্রামাণিক)

আদি-মধ্য যুগের (উপস্তর) বাংলা ভাষার একটি মাত্র প্রামাণিক নিদর্শন মিলেছে : বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বসন্তরঞ্জন রায় তা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কার করেন। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন।

অন্য নিদর্শন (কল্পিত)

কেউ কেউ মনে করেন নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিও এই আদি-মধ্য উপস্তরের রচনা। এগুলি হলো— (ক) মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', (খ) কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী', (গ) বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়', (ঘ) নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল', (ঙ) বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'।

কিন্তু এগুলির ভাষা বার বার এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, এগুলিতে 'আদি-মধ্য'যুগের বাংলা ভাষার স্থিটেফোঁটা নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয় নি। তাই পণ্ডিতেরা এগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার উপর নির্ভর করেই 'আদি-মধ্য' বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন। কারণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে মূলে হস্তক্ষেপ বেশি হয়নি এবং একমাত্র এটিই সেকালের ভাষা সুরক্ষিত হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন এ-বিষয়ের প্রথম প্রবক্তা। পরবর্তীকালে তাঁদের পথই ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুসরণ করেছেন। আমরাও সেই নির্দেশিত পথেই 'আদি-মধ্য' বাংলা স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছি :

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। আদি-মধ্য বাংলাভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— আ-কারের পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে, তা ক্ষীণ হয়। যেমন :

আউলাইল। আইহন। গাইল। মাইলোঁ। বড়ায়ি।

(এখানে ক্ষীণ হয়েছে— উ, ই, ই, ই। বড়ায়ির উচ্চারণ হয়েছে = বড়াই)।

২। আদি-মধ্য বাংলায় আ-কারের পরে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে, সে-দুটি মিলিয়ে যৌগিক-স্বরের সৃষ্টি হয়। যেমন :

আ এ (বাএ, রাএ)। আই (গাইল, নাইল)। আও (জাওঁ, লুকাওঁ)।

৩। আদি-মধ্য বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য—নাসিক্য ব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) যোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ। যেমন :

কাম্তি > কাঁতি। ঝম্প > ঝাঁপ।

(তবে এর ব্যতিক্রমও প্রচুর— কাণ্ড/কুম্ভার/আম্হি।)

৪। আদি-মধ্য যুগে বাংলা ভাষার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য—মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণ লোপ অথবা ক্ষীণতা। যেমন :

কাহ্ন > কানু। বুঢ় > বুড়। আহ্মি > আমি।

৫। আদি-মধ্য বাংলার একটি অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ— অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে 'হ্' ধ্বনি থাকলে ঐ অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণে পরিণত হয়। যেমন :

একহোঁ > এথোঁ। কবহোঁ > কভোঁ। কতহো > কথো।

৬। আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষায়— ই-কার অনেকসময় উ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :

দ্বিগুণ > দুগুণ। দ্বিচারিণী > দুচারিণী।

৭। এই যুগের বাংলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেই) প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার ফলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন :

আহর (অপর)। আতিশয় (অতিশয়)। আন্ধারী (অন্ধকার)। আথান্তর (অবস্থানন্তর)। আমান (অমান্য)। আইহন (অভিমন্যু)। আভিসার/ আনল/ আসুখ/ আঝর/ আধিক/ আমৃত/ আভাগী।

৮। এই যুগের ভাষায়, যত্রতত্র আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগে ঘটেছে। যেমন :

শবদেঁ / হআঁ / মোঁ / কৈলোঁ / হারায়িলোঁ / করিতেঁ।

নহোঁ / জাওঁ / পসিআঁ / লুকাওঁ / আউলাইলোঁ।

বংশীখণ্ডের 'কে না বাঁশি' পদে এই ১১টি আনুনাসিক শব্দ আছে।

৯। এই যুগের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বানানে নিম্নলিখিত ধ্বনিগুলির পার্থক্য রক্ষিত হয় নি :

(১) ই, ঈ = আঁখি / আঁখী। দুতি / দূতী। সিতল / সিশেব। সিতা।

(২) উ, ঊ = উজল / ঊজল। তীন। চুরী। অনুমতী। ছাড়ী। হাথীবাক। জাউ/ জাঊ।

(৩) ণ, ন = মণ / মন। পুণী / পুনী। কেমণে / কেমনে। পাণী / পানী। শাল / নাল।

(৪) শ, ষ, স = শীতার / শলিল, হেষ / সসা। সশুর/ শীতল / সিশের।

(৫) য, জ = জাএ / যাএ। জাওঁ / যাওঁ। জাই / যাই। জাইবে / যাইবেঁ। জান / যান। যত / জত।

(৬) য, অ = খঅ (ক্ষয়)।

সুতরাং মনেকরি সেকালের উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভেদ ছিল না। তাই বানানে এদের নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০। আদি-মধ্য যুগের ভাষায়, শব্দের আদিস্থিত উ-কার ও-কারে (উ > ও) এবং ও-কার উ-কারে (ও > উ) পরিণত হয়েছে। যেমন :

উ > ও = গুপতে > গোপত। বুলে > বোলে। তুলি > তোলী।
ও > উ = গোআলী > গুয়ালি,

১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি সুপরিচিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন :
(ক) স্বরভক্তি / বিপ্রকর্ষ : বারিষা (বর্ষা)। বেআকুল (ব্যাকুল)। গেআন (জ্ঞান)। তরাসে (ত্রাসে)। মুগধী (মুগ্ধ-স্ত্রীলিঙ্গে)। পুরুবে (পূর্বে)। আরতি (আর্ত্তি)। শকতি (শক্তি)।
(খ) স্বরসঙ্গতি : রহিলী (রহিল)। অনুপামা (অনুপম)। তোহ্মারা (তোহ্মার)। বিকলি (বিকল)।
(গ) ধ্বনি লোপ : যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ—দুলভ (দুর্লভ)। সামী (স্বামী)। তন (স্তন)। আখর (অক্ষর)।
(ঘ) ধ্বন্যাগম : নতুন ধ্বনির সংযোগে অযুক্তবর্ণ যুক্তবর্ণে রূপ পেয়েছে— ছিণ্ডিআঁ (আগম = ণ); আহ্মারে (আগম = হ); পাম্বি (আগম = ব)।
(ঙ) মিশ্রণ : খরল = খর + গরল, গহীণ = গহন + গভীর।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদি-মধ্যযুগের বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) ভাষার একটি প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো— কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি— (এটি চর্যাতেও ছিল— আজও আছে)। যেমন :
কাক কাঢ়ে রাএ। তেলি আগে জাএ। আন্তর পোড়এ এবেঁ।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীবর। চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।

২. এই যুগের ভাষায় গৌণকর্ম ও সম্প্রদানকারকে 'ক', 'কেঁ', 'রে' বিভক্তি মিলে। যেমন :
ক = হান পাঁচবাণ তাক না করিহ দয়া।
কে = কংসেকে বুলিল কন্যা; কাহ্নাঞিকে বোল সে আপনে।
রে = সাপেরে করিআঁ বিষদানে।

৩. এই যুগের ভাষায় করণ কারকে 'ত', 'এ', 'এঁ', বিভক্তি বর্তমান। যেমন :
ত= হাথত ধরিআঁ মোর দগধপরাণে।
এ = মিছহি মাথাএ পাড়এ সান।
এঁ = নিজ মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।

৪. আদি-মধ্যযুগের ভাষায় সম্বন্ধ পদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র', 'এর', 'ক', 'কের'। যেমন:
র = ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারি।
এর = উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারি।
ক = আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
কের = তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে।

৫। আদিমধ্য যুগের গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপাদানকারকে 'ত', 'তে', 'তেঁ' বিভক্তি লক্ষণীয়। যেমন :
ত = আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মনে;
মাত বাপত বড় গুরুজন নাহী।
তে = জলতে উঠিলী রাহী।

৬। এযুগের ভাষায় অধিকরণে 'এ', 'ত', 'তে', 'ত' ইত্যাদি সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন মিলেছে। যেমন :

এ = পথে মাহাদানী থুইলা; বাট হএ ঘাট কাণ্ডারীর দান বটে।
ত = সেজাত সুতিআঁ; বাটত সুজিআঁ দান।
তে = সিসতে সিন্দুর।

৭। এ যুগের ভাষায় কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কিছু কারকেও বিভক্তিহীনতার সন্ধান মেলে। যেমন :
কর্ম— ধরল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে। চতুর্দিশ চাহী কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
অধিকরণ— তবেঁ তৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
করণ— বাড়ই সো তরু সুভাসুভ পানী।

৮। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন সৃষ্টি হয়েছে 'রা' বিভক্তি যোগে। যেমন :-
তোহ্মারা, আহ্মারা, তারা। পুছিল তোহ্মারা কেহে তরসিলা মনে।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।

৯। এ যুগের ভাষায় তির্যক কারকের অর্থে নানান অনুসর্গের ব্যবহার ঘটেছে। যেমন :
আন্তর— তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
মাঝেঁ— বনমাঝেঁ পাইল তরাসে।
সমে— তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।
পানে— মোর পানে চাহে যত লোক জাএ হাটে।
ঠাঁই— কেহে হেন মিছা কথা কহ মোর ঠাঁই।
কারণ— কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।

১০। এ যুগের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বচন নিষ্পন্ন হয়েছে দুই ভাবে :
(ক) প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে 'গণ', 'সব', 'জন', 'রা', 'এরা' যোগ করে— যেমন— দেবগণ, গোপীজন, সব সখি, আহ্মারা/তোহ্মারা/তারা।
(খ) অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে শুধু 'গণ' যোগ করে— যেমন— প্রণামগণ, বাদ্যগণ, আভরণগণ।

১১। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে 'ই', 'ইআঁ', 'ইতেঁ', 'ইলে', 'ক' যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়েছে। যেমন :
ই— উড়ি পড়ি জাওঁ।
ইআঁ— পশিআঁ লুকাওঁ।
ইতেঁ— তুলিতেঁ পানি।
ইলে— বুইলে মধুর বানী।
ক— করিবাক পারে।

১২। এ যুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। যেমন :—
রহিলছে > রহিল + আছে; লইছে > লই + আছে। বুলিলছে, আনিছিল।
এছাড়াও আমরা আরও তিনটি যৌগিক ক্রিয়ার উল্লেখ করছি—
চলি গেলি রাধিকা হরিষে। চাহিলেহ কাহ্নাঞি বাঁশি। রাধা চলি জাএল।

১৩। এ যুগের ভাষায় উত্তম পুরুষে অতীত কালে 'লোঁ', 'ইল'; বর্তমান কালে 'ওঁ', 'ই' এবং ভবিষ্যত কালে 'ইব' যোগ হয়েছে। যেমন :
অতীত— চিণ্ডিলোঁ। আনিলোঁ। ছাড়িলোঁ মো মাহাদান। আবতিল— আরতিল কাক। আখাযিল। পাকিল।

বর্তমান— তুলী লৈলোঁ। দহে পইসওঁ। দেখিতে না পাওঁ। আমহে করি। শুনি।
ভবিষ্যৎ— করিব। জাইব। খেলাইবোঁ।

১৪। এ যুগেও ভাষায় 'যা' ও 'হু' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাববাচোর প্রচলন ছিল। যেমন :

তাতেকে সুকাল গেল মোর মহাদানে।

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাম-ধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে। যেমন :

হেন মনে পড়িহাসে। এবেঁ তাক উপেখহ কেহে।

তিন ॥ ছন্দ-বৈশিষ্ট্য [১]

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় ছন্দ-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এই যুগের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রথম 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির (তানপ্রধান) পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী এবং মহাপয়ার জাতীয় ছন্দ-বন্ধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। যেমন :

পয়ার—	পাখি নহোঁ তার ঠাঁই	উড়ী পড়ি জাওঁ।	৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা
ত্রিপদী —	চান্দ সুরুজের	ভেদ না জানো	
	চন্দন শরীর তাএ।		৬ + ৬ + ৮ = ২০

দুই ॥ (আ) ॥ অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Late-Middle-Bengali-Language)

(১) কালসীমা :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন— ১৫০১ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ। তবে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে এর স্থিতিকাল ১৫০১ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ আর সেই সঙ্গে সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে এর স্থিতিকাল ধরতে হয় ১৫০১ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) নিদর্শন :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক নিদর্শন প্রচুর। তার সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো :

(১) বৈষ্ণবপদাবলী	:	জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখের পদাবলী
(২) বৈষ্ণব (চৈতন্য) জীবনী	:	চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি
(৩) মঙ্গলকাব্য	:	মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখের গ্রন্থ
(৪) অনুবাদ কাব্য	:	কাশীরামদাস প্রমুখের গ্রন্থ
(৫) মুসলমানী সাহিত্য	:	দৌলত কাজী ও আলাওলের গ্রন্থ
(৬) শাক্তপদাবলী	:	রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখের রচনা।

এই সব অসংখ্য রচনা থেকে অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। আর তা থেকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা এই উপস্তরের বাংলা ভাষার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করেছেন :

১. বিস্তৃত আলোচনা— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত— ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা (শিলালিপি সং ১৯৯৭) পৃ. ৫২ - ৫৪

(৩) ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—পদার্থস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কারের লোপ। যেমন :—

প্রাণ্ ছনছন্ করে 'আমার্ মন্ ছনছন্ করে।
একলা ঘরে রৈতে নারি কিসের যেন ডরে॥

কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এই লোপ ঘটে নি। যথা :

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

২. অন্ত্য-মধ্য স্তরের ভাষায় আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়েছে ও তার ফলে মধ্য স্বরের লোপ ঘটেছে। যেমন :

হল্‌দি— (হল্‌দি বরণ গোরাচাঁদ পড়া গেল মনে), অম্‌নি; গাম্‌ছা; পাগ্‌লা।
(´ = শ্বাসাঘাতের চিহ্ন)

৩. এই যুগে অপিনিহিতি ও বিপর্যাস ছিল। তারই ফলে 'ই' এবং 'উ' অনেকসময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে বসেছে— কখনো 'উ' 'হু' তে পরিবর্তিত হয়েছে—কখনো ব্যঞ্জনের পূর্বে বসা 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে। যেমন :

মাগু > মাউগ > মাগ [ম্ + আ + গ্ + উ > ম্ + আ + উ + গ্ > ম্ + আ + গ্]
ফাগু > ফাগু > ফাউগ্ > ফাগ্
কালি > কাইল > কাল্ [ক্ + আ + ল্ + ই > ক্ + আ + ই + ল্ > ক্ + আ + ল্]

এই উদাহরণ গুলিতে স্পষ্টতই দেখছি 'ই' বা 'উ' ব্যঞ্জনের পূর্বে বসেছে, কিন্তু 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে।

৪. এই যুগের ভাষায় অভিশ্রুতির নিদর্শনও মেলে। যেমন :

পাতিয়া > পাইত্যা > পাত্যা, পেতে।
খাইয়া > খা'য়া > খায্যা , খেয়ে।
বানিয়া > বাইন্যা > বেনে।

৫. এই যুগে সাধু ও চলিত ভাষায় 'নহ', মহ এবং ঢ-কার যুক্ত নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। যেমন :

বুঢ় > বুড়। কাহ্ন > কান। আহ্মার > আমার।

৬. অন্ত্যমধ্যযুগে শ্রুতিধ্বনি ('য়', 'ব' এবং 'হ')-এর প্রাবল্য এযুগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন :

ছাওাল > ছাওয়াল। বাএ > বাহে।

৭. এ যুগের ভাষায় প্রচুর অর্ধতৎসম শব্দ পাওয়া যায়। যেমন :

ব্যবহার > ব্যাভার। ক্ষমা > খেমা। ভৎর্সন > ভর্ছন।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় একটি প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো— সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যেমন— বক্সা বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল। যুবতীরা কয়।

২। নির্দেশক বহুবচনে 'গুলি', 'গুলা' এবং তির্যক কারকের বহু বচনে 'দি', 'দিগ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

কি কারণে দেবসভা বল এতগুলি।
মূলার সমান দন্ত গুলা।
তাহা দিগে ধরিত্রী আনহ মোর ঠাঁই।

৩। এই যুগে নাম-ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার ছিল— তৎসম শব্দও নাম-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

শাস্তাইব। লাথাইয়া। আওসরি। বাখানিয়াছে।

৪। এই যুগের ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। যেমন :

পিয়ে (পান করে)। পুছে (জিজ্ঞাসাকরে)। জিনে (জয়করে)।

৫। এই যুগের ভাষায় নিম্নলিখিতভাবে কারক ও বিভক্তি চিহ্নিত হয়েছে :

কর্তৃকারক : শূন্য বিভক্তি— প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।
কর্তৃকারক : এ বিভক্তি— এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে।
কর্মকারক : কে বিভক্তি— বীরকে লাগিল ব্যথা।
করণ কারক : এ, তে বিভক্তি— মায়াতে মোহিত সব।
অপদান কারক : ত বিভক্তি— দূরত দেখিলে পুড়ে মন।
অপদান কারক : তে বিভক্তি— রাজাতে বিদায় মাঙ্গে।
অপদান কারক : কে বিভক্তি— ইহাকে অধিক তুমি জানিও তাঁহার।
সম্বন্ধপদে : 'র', 'ক', 'কর', 'কার', ' কের' প্রভৃতি বিভক্তি মেলে—
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল।
অধিকরণ : 'এ', 'তে', 'রে', 'কে' বিভক্তি—
তোমার কুটীরে হৈল মোর দরশনে।
সেউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। 'এথাকে আনহ'।

৬। এযুগেও 'ইল' দিয়ে অতীত কাল এবং 'ইব' দিয়ে ভবিষ্যত কাল গঠিত হয়েছে। যেমন—

অতীত : করিল, পূজিল, জানিল, ছাড়িল।
ভবিষ্যত : থাকিবে, পারিবে, মাখিবে, রাখিবে, বাড়িবে, ছাড়িবে।

তিন।। ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

অন্ত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ছন্দ-বন্ধের আরও বহু বিচিত্র রূপ লক্ষ্য করা গেল। আদি মধ্য যুগে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী ছন্দ ছিল। এ যুগেও সেগুলির বহু ব্যবহার ঘটলো। কিন্তু ছন্দ-রীতির নতুন নমুনা মিললো অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে লোকরীতির ছন্দ স্বরবৃত্তের (লোচনদাস, ভারতচন্দ্র, নরহরি চক্রবর্তীর রচনায়)। এছাড়া এসময় ব্রজবুলি কবিতায় মাত্রাবৃত্তের পর্যাপ্ত ব্যবহার দেখা গেল। বাংলা কবিতায় ভারতচন্দ্র, নরহরি চক্রবর্তী মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার দেখালেন। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে তৃণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের নিখুঁত ব্যবহার করলেন। ছন্দের শিল্পশালা গড়েছেন ভারতচন্দ্র।

চার।। বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ও শব্দ ভাণ্ডারের পুষ্টি

এ যুগের ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। এ সময় মুসলমা'নেরা দেশ শাসন করছিলেন। তাঁদেরই মাধ্যমে বহু আরবী, ফার্সী, তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত

হয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দু-চারটি আরবী, ফার্সী শব্দ ছিল। এ সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে মানুষের মুখে ও সাহিত্যে তা ব্যবহৃত হলো। এক ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার নিদর্শন প্রচুর। যেমন :

আরবী ফার্সী : আইন, আদমী, কেতাব, কেতাবে, আজব, বাজনা, আতর, কামান, খেয়াল, আন্দাজ, নমাজ, নজরানা, তাজ্জব, লস্কর।
তুর্কী : বিবি, বেগম, খাঁ, খাতুন, বাবা, বন্দুক, চাকু। লাশ, দারোগা, বারুদ, কাঁচি, কুলি বোয়াক, উর্দু।
পর্তুগীজ : মস্করা, জানালা, গামলা, তামাক, আতা, পেঁপে, পেয়ারা। আনারস, পাঁউ, গন্ত, বোতাম, বোতল, চাবি, কামরা।

পাঁচ ॥ ব্রজবুলির প্রচুর ব্যবহার

এই সময় মৈথিলী বিদ্যাপতির পদ এদেশে কীর্তন গানে খুব জনপ্রিয় ছিল। ব্রজবুলি হলো মৈথিলী, অবহট্‌ঠ ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে একটি 'সাহিত্যিক কৃত্রিম ভাষা'। অন্ত্যমধ্য যুগে বৈষ্ণব কবিরা বাংলা ভাষার সমান্তরালে এই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে গোবিন্দদাস, জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্তী ও যদুনন্দন প্রমুখের খ্যাতি ছিল সর্বজন বিদিত। একটি ব্রজবুলি পদাংশ উদ্ধৃত হলো :

কণ্টক গাড়ী কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।। — গোবিন্দ দাস।

□ তিন □ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Modern Bengali Language)

(১) ভূমিকা

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব দশম শতাব্দীতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা নানা ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। এই হাজার বছরের ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা তিনটি যুগে বা স্তরে বিন্যস্ত করেছেন :

ক. আদিস্তর বা প্রাচীন বাংলা (৯০০-১৩৫০ খ্রী)
খ. মধ্যস্তর বা মধ্য বাংলা (১৩৫১-১৭৬০/১৮০০ খ্রী)
গ. আধুনিক স্তর বা আধুনিক বাংলা (১৭৬১/১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত)।

তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

(২) কালসীমা

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে বাংলার আধুনিক স্তরের আরম্ভ'। তবে কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সাল ১৭৬০ খ্রীঃ থেকেই এর সূচনা ধরতে চান। সম্প্রতি স্থির হয়েছে, আধুনিক বাংলার সূচনা ও বিস্তৃতি কাল হলো— 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজপর্যন্ত'।

(৩) নিদর্শন

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় ও ভাবের বিচারে সর্বতোমুখী প্রসার লাভ করেছে। সেগুলি হলো :

১. কাব্য কবিতা (মহাকাব্য আখ্যানকাব্য গীতিকাব্য) — মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সতীন্দ্রনাথ, অমিয়, বিষ্ণু, সুনীল।

২. গদ্যরচনা — উপন্যাস — বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, তারাশঙ্কর, মানিক, মহাশ্বেতা।
— নাটক — মধুসূদন, গিরিশ, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, বিজন, শম্ভু।
— ছোটো গল্প — রবীন্দ্র প্রভাত শরৎ মানিক সুনীল, সুধাময় চক্রবর্তী।
— প্রবন্ধ — বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, প্রমথ, সুবোধ, সুকুমার সেন, ক্ষুদিরাম দাস।
— জীবনী — রবীন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার।

(ঙ) আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলা ভাষার তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করবার মতো—

১. লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য।
২. লেখ্যভাষায় কবিতা রচনার পাশে গদ্যে বিবিধ রচনার বিকাশ।
৩. ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার।

প্রধানত গদ্যরীতিতে দুটো রূপ গড়ে উঠেছে—

ক. সাধুরীতি
খ. চলিতরীতি (কথ্যরীতি)।

সাধুরীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য লেখা চলছিল। উনিশ শতকে সাধুরীতি পরিপুষ্টি লাভ করে। পরবর্তীকালে চলিত গদ্যের ধারাটি সাহিত্য রচনার বাহন হয়ে উঠে। তাই এই যুগের ভাষার আলোচনায় সাধুরীতি ও চলিত রীতির কেউ কেউ পৃথক পৃথক, কেউ কেউ পাশাপাশি আলোচনা করেছেন।

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য ও অনুসর্গের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু চলিত (কথ্য) ভাষায় সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায়। যেমন—

সাধু > চলিত

ক্রিয়া : করিতেছি > করছি, করিয়াছিলাম > করছিলাম, করিব > করব।
বিশেষ্য : বানিয়া > বেনে, জালিয়া > জেলে, পটুয়া > পোটো।
সর্বনাম : তাহা > তা, তাঁহার > তাঁর, উহা > ও, উহার > ওর।
অনুসর্গ : সহিত, সমভিব্যাহারে > সঙ্গে, হইতে > হতে, অপেক্ষা > চেয়ে।

২. সাধুভাষায় সংস্কৃত, তৎসম, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ এবং আভিধানিক শব্দের প্রাচুর্য; কিন্তু চলিত ভাষায় সহজ সরল ও বহু প্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধুভাষায় বাক্যের জটিলতা, শব্দের দুর্বোধ্যতা, প্রকাশের গুরু গম্ভীরতা লক্ষণীয়। কিন্তু চলিত ভাষা এই সব গুলিকে পরিহার করে চলতে চায়। চলিত ভাষায় সংস্কৃতের পরিবর্তে তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্য। তার চাল লঘু ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাতে আছে কৃত্রিমতামুক্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য।

৩. অভিশ্রুতির প্রাচুর্য। মধ্যযুগের বাংলায় ছিল অপিনিহিতি ও বিপর্যাস। আধুনিক বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির পরের স্তর অভিশ্রুতি। যেমন—

করে। কাঁদিয়া > কাঁইদ্যা > কেঁদে। [illegible]
পড়িয়া > পেড়ে। বউল > বোল। [illegible]

৪. আধুনিক বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে স্বরসংগতি [illegible] বা প্রায়সমিল স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—
বিলাতি > বিলিতি। [illegible]

৫. এ যুগের ভাষায় ব্যঞ্জন সংগতি বা সমীভবনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—
পদ্ম > পদ্দ। গল্প > গপ্প। [illegible]

৬. ধ্বনিবিপর্যয় এ যুগের ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যেমন—
আলনা > আনলা; [illegible]

৭. স্বরাগম ও ধ্বনিলোপ এই যুগের ভাষায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণ। যেমন—
স্কুল > ইস্কুল; স্পর্ধা > আস্পর্ধা; [illegible]
নাতিনী > নাত্নী; উদ্ধার > ধার।

৮. শব্দার্থ পরিবর্তন (শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, [illegible]) আধুনিক বাংলাভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন—
'কালি' = আদি অর্থ—তরল কালো রং; প্রসারিত অর্থ—যে কোনো রং এর তরল রূপ।
'ভৃত্য' = আদি অর্থ—ভরণের যোগ্য; সংকুচিত অর্থ—চাকর।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। আধুনিক বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। যেমন—
গান করা, বাজনা বাজানো, বসে পড়া, শুয়ে থাকা,
প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া, নৌকা বাওয়া, বিলম্ব করা।

২। ড. সুকুমার সেন বলেছেন,— অ-কারান্ত কোনো কোনো নিজন্ত ধাতুর রূপ অনিজন্ত হয়ে দাঁড়ালো। যেমন—
পেলা, ফেলা (পেলায়, ফেলায়) > ফেল (ফেলে),
খলা (খেলায়) > খেল (খেলে), পৌঁছা > পৌঁছ।

৩। আধুনিক বাংলায় সংযোজক অব্যয়রূপে 'ও', 'এবং' শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। তবে সাধারণত মনে করা হয় 'ও' দুটি পদকে যোগ করে। 'এবং' দুটি বাক্যকে যোগ করে। ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এদের ব্যবহার পর্যাপ্ত। যেমন—
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে গিয়েছিল এবং গোদাবরী তীরে তারা কুড়ে বেঁধেছিল।

৪। আধুনিক বাংলায় নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নি', 'নাই' প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। এই রীতিটি আধুনিক-পূর্ব যুগে ছিল না। এর উদাহরণ :
সে খেল না। (সমাপিকা ক্রিয়া)।
সে না খেয়ে চলে গেল (অসমাপিকা ক্রিয়া)।

৫। আধুনিক বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যে প্রকাশ করার রীতি দেখা যায়। যেমন—

একাধিক বাক্য = সে গান গাইল। সে পুরস্কার পেল। সে বাড়ি ফিরল। সে মাকে দেখাল।

একটি সরল বাক্য = সে গান গেয়ে পুরস্কার পেয়ে বাড়ি ফিরে মাকে দেখাল।

৬। আধুনিক বাংলায় পদ গঠনের বিচিত্র বিধি। পণ্ডিতেরা বলেছেন কর্তৃপদ তিন রকমের (১) বিভক্তিহীন (২) 'এ' বিভক্তি যুক্ত; (৩) নির্দেশক প্রত্যয় যুক্ত। যেমন—

রাস্তায় লোক চলেছে। পাগলে কি না বলে। লোকটা গেল কোথায়?

তিন॥ বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ

বিদেশী শব্দ গ্রহণ— আধুনিক ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ ঢুকছে—সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য গত কারণে। যেমন—

ইংরেজী শব্দ— গ্লাস, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, ইউনিভার্সিটি, রিস্টওয়াচ।

পর্তুগীজ শব্দ— আলপিন, আলমারি, কেরানী, চাবি।

এছাড়া বহু বিদেশী উপসর্গ বাংলা শব্দে যুক্ত হয়েছে। যেমন :

ফি (ফি বছর) যে (বেয়াদপি), হাফ (হাফটিকিট), ফুল (ফুলহাতা)।

চার॥ ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ছন্দের দ্যোতনা আমাদের মুগ্ধ করে। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত—এই তিন প্রধান ছন্দ এবং অমিত্রাক্ষর, গদ্য কবিতার ছন্দ প্রভৃতি ছন্দ-বন্ধ বাংলার ছন্দের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসমৃদ্ধ করেছে॥

□ 'সংস্কৃতভাষা বাংলাভাষার জননী' কি না □

বাংলাভাষার জন্ম 'মাগধী-অপভ্রংশ' থেকে— সংস্কৃতভাষা বা মাগধী-প্রাকৃত থেকে নয়।

বাংলাভাষার জন্ম নিয়ে চলিত ধারণাটি হলো—'সংস্কৃতভাষাই বাংলাভাষার জননী'— অর্থাৎ সংস্কৃতভাষা থেকেই বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে। এই ধারণার মূলে আছে প্রধানত ৪টি কারণ :

১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আধিক্য।

২. তদ্ভব শব্দ বা খাঁটি বাংলা শব্দগুলির সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের গভীর ও নিকট সম্পর্ক।

৩. ভাষাতত্ত্বগত অধ্যয়নে প্রাপ্ত সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতা।

৪. সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের গৌরবে গৌরব লাভের মানসিকতা।

— এজন্যেই 'সংস্কৃতভাষা যে বাংলাভাষার জননী'— এই সিদ্ধান্তই ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

কিন্তু এখন বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করেছেন। তার উৎস নিয়ে এখন প্রচুর অনুসন্ধান হয়েছে। তাতে স্থির হয়েছে যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা অতি নিকট সম্পর্ক অবশ্যই আছে— কিন্তু সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকেই যে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, একথা ঠিক নয়।— কারণ ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যভাষা-'বৈদিক সংস্কৃতে'-র যে কথ্যরূপ—তা থেকে জন্ম নিয়েছে

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা 'প্রাকৃত', সেই প্রাকৃতেরই মধ্যে অন্তে নানা স্তর পরম্পরা—নানা আঞ্চলিক রূপ—তেমন একটি আঞ্চলিক রূপের স্তর থেকেই জন্মেছে 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা'— বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি। অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত কথ্য (প্রাচীন ভারতীয় আর্য) > প্রাকৃত আঞ্চলিক (মধ্যভারতীয় আর্য) > বাংলা প্রভৃতি (নব্য ভারতীয় আর্য)।

সুতরাং 'বাংলা ভাষার জননী' বলতে সরাসরি সংস্কৃতকে বলা যাচ্ছে না। তার কারণ :

১. সংস্কৃত নামক ভাষাটি বৈদিক ভাষার পরবর্তীকালে সৃষ্ট— তা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।— তা কখনো কথ্যভাষা ছিলো বলে জানা যায় নি। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আর্যভাষাভাষী একটি জনগোষ্ঠী ভারতে আসে। তারা যে-ভাষায় কথা বলতো, তার নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য'।

এই ভাষারই একটি শিষ্টরূপ আছে 'বৈদিক সাহিত্যে'। সেই বৈদিকভাষাই ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে। তার গঠনে, রূপে ও স্বরূপে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। তখন তাকে একটি সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্যেই বৈদিক ভাষার সংস্কার ঘটে। আর সেই সংস্কারকৃত ভাষার নাম হয় 'সংস্কৃত'। কিন্তু তা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমরা শিথিলভাবে এই বৈদিক ও সংস্কৃতকে 'সংস্কৃত' বলে অভিহিত করি। এই সংস্কারকৃত সংস্কৃতেরও প্রচুর নিদর্শন আছে সাহিত্যে। সাহিত্যের ভাষা বলেই এই সংস্কৃতের কোনো বিবর্তন হয় নি। নানা কারণেই ভাষা বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হয়,— বহু নতুন নতুন শব্দ, প্রত্যয়, ধাতু তাতে ঢুকে পড়ে। পুরাতন শব্দের অর্থ বদলে যায়; কখনো অর্থ পরিত্যক্ত হয়; শব্দরূপ বা ধাতুরূপের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার এরকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে নি। ফলে সংস্কৃত ভাষা 'মৃত' ভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু কোনো মৃত ভাষা থেকে অন্য কোনো ভাষার জন্ম হতে পারে না। তাই সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় নি।

অপরপক্ষে সেকালে বৈদিক ভাষা ছিল জীবন্ত ভাষা। কারণ সে ভাষার একটা কথ্য রূপ ছিল। ভাষাবিজ্ঞানীরা সেই কথ্যরূপের বিবর্তনের মধ্যেই মধ্যবর্তী স্তর,—এবং তা থেকে নব্যস্তরের সন্ধান পেয়েছেন। অর্থাৎ বৈদিক-কথ্যরূপ > মধ্যস্তর (প্রাকৃত-অপভ্রংশ -অবহট্‌ঠ) > অন্ত্যস্তর— বাংলা . . . . প্রভৃতি।

২. জীবন্ত ভাষা নদীর স্রোতের মতো প্রবহমানা। তাতে যেমন শাখানদী জন্মায়, তেমনি উপনদীও মেশে। আর সে নদী কোনো অঞ্চল-বিশেষে বিশাল বড়ো বাঁক নিলেই, নদীর নামটি পাল্টে যায়। ভাষার মধ্যেও তেমনি বিশাল পরিবর্তন এলে তারও নতুন নামকরণ হয়। তাই বৈদিক-কথ্যভাষাই খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতকে নতুন নামে চিহ্নিত হলো 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা' বা 'প্রাকৃত' বলে। এই প্রাকৃতেরও নানা স্থানে নানা নাম। অঞ্চল বিশেষেই সেই নাম। তেমনি একটি নাম— 'মাগধী প্রাকৃত'। কিন্তু এই মাগধী প্রাকৃত থেকেও বাংলা ভাষার জন্ম হয় নি। কারণ মাগধী প্রাকৃতের প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলায় অবিকৃত দেখা যায় না।

তবে এই মাগধী প্রাকৃতের নানা স্তরভেদ আছে। তার একটি স্তরের নাম 'মাগধী অপভ্রংশ'। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ভারত ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ার্সন বলেছেন, এই মাগধী অপভ্রংশ থেকেই বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষা- গুলির জন্ম। তবে এই মাগধী অপভ্রংশের কোনো লিখিত (সাহিত্যিক) প্রমাণ মেলেনি। সেজন্যে একদল ভাষাবিজ্ঞানীরা মাগধী অপভ্রংশের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিতে চান। তাঁদের মতে, 'কথ্য-প্রাকৃত থেকেই বাংলার জন্ম'।

আর এক বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'গৌড়ীয় অপভ্রংশ' থেকেই বাংলার জন্ম। এবং তা জন্মেছে মাগধী প্রাকৃত থেকেই। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের

ব্যাকরণে এই 'গৌড়ীয়-রীতি'টির উল্লেখ আছে। 'গৌড়ীয় রীতি' মানে গৌড়বঙ্গের লোকমুখের ভাষা। সুতরাং শহীদুল্লাহর মতটি মানলেও সংস্কৃত ভাষা যে বাংলা ভাষার জননী নয়, তা স্বীকৃত হয়ে পড়ে।

তবে অধিকাংশ পণ্ডিতই আচার্য সুনীতিকুমারের মতটি মেনে নিয়েছেন। বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' (রচনাকাল খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী), আদি-মধ্যযুগের একমাত্র বাংলা সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী), তারপর অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী', জ্ঞানদাস প্রমুখের 'পদাবলী', নানা চৈতন্যজীবনী ও সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলার জন্ম হয়নি— বাংলার জন্ম হয়েছে 'মাগধী অপভ্রংশ' থেকে। সুনীতিকুমার তার প্রমাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে' ইত্যাদি চরণটির সর্বপ্রকার প্রাচীন ভাষারূপ নির্মাণ করে। যেমন ঃ

আধুনিক বাংলা	ঃ গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
মধ্যস্তরের বাংলা	ঃ গান গায়্যা নাও বায়্যা কে আস্যে পারে।
প্রাচীন বাংলা	ঃ গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারহি।
মাগধী অপভ্রংশ	ঃ গাঁণ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই আবিশই পারহি।
মাগধী প্রাকৃত	ঃ গাণং গাধিঅ নাবং বাহিঅ কনে নাবিশদি পারধি।
বৈদিক (কথ্য)	ঃ গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা ককঃ আবিশতি পারধি।

— এ থেকেও বুঝি, মাগধী-অপভ্রংশের সঙ্গেই বাংলা ভাষার সর্বাধিক গভীর যোগ। এজন্যেই বাংলাভাষার জননী হিসেবে মাগধী-অপভ্রংশের নামই সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু , ডঃ রামেশ্বর শ, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বীকার করেছেন। তাই সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার জননী বলা চলে না॥

৪ | বাংলা উপভাষা

□ এক □ উপভাষা : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

'A Dictionary of Linguistics'-এ 'উপভাষা'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে' :

> A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronounciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.[১]

এ থেকে বুঝি :

> উপভাষা হলো—একটি ভাষার অন্তর্গত এমন একটি বিশেষ রূপ, যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে, যার সঙ্গে সেই আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ভাষাচার্য সুকুমার সেন বলেছেন :

> 'কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাগুলিকে উপভাষা বলে।'[২]

তাঁর মতে, ভাষার কাজে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি-ব্যবহারকারী জনমণ্ডলীকে বলে 'ভাষা-সম্প্রদায়'। কিন্তু এক একটি ভাষাসম্প্রদায় যে-ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে, সেই ভাষার রূপ সর্বত্র এক রকম নয়। যেমন—'বাংলা ভাষাসম্প্রদায়ে'র কথা ধরা যাক্। সমগ্র পশ্চিম বাংলা ও পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) মিলে যে বিরাট অখণ্ড বাংলাদেশ— তার সর্বত্রই যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়, তার নাম 'বাংলা ভাষা'। এই হলো 'ভাষা সম্প্রদায়'।

কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যায়—এই অখণ্ড বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে পুরুলিয়ার লোকে যে ভাবে বাংলা বলে, পূর্বাংশে ময়মনসিংহের লোকেরা সেভাবে বলে না। উত্তরাংশে কোচবিহারের লোকেরা আরও অন্য রকম করে বলে। তাহলে—পুরুলিয়ার মানুষের মুখের ভাষা এক রকম, ময়মনসিংহের মানুষের মুখের ভাষা আর এক রকম, কোচবিহারে মানুষের মুখের ভাষা আরো অন্য রকম। তেমনি শ্রীহট্টের মানুষের মুখের ভাষা আরো আলাদা এক রকম। অথচ সবই তো বাংলা ভাষা। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক-পার্থক্য-যুক্ত লৌকিক বা স্থানীয় কথ্যভাষা— তাকেই মূল ভাষাটির 'উপভাষা' বলে।

যেমন : বাঁকুড়ার উপভাষা, কোচবিহারের উপভাষা, ময়মনসিংহের উপভাষা, পুরুলিয়ার উপভাষা, দক্ষিণ ২৪-পরগণার উপভাষা।

সুতরাং উপভাষার বৈশিষ্ট্য হলো—

১। উপভাষা একটি আদর্শ ভাষার একান্ত আঞ্চলিক রূপ।

১. A Dictionary of Linguistics (London 1970) : P. 56
২. ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৭১) পৃ. ৫

২। উপভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৩। উপভাষার এই পার্থক্য তার আদর্শ ভাষাকে ছাড়িয়ে যায় না। (ছাড়িয়ে গেলেই তা পৃথক ভাষা বলে গণ্য হবে)।

৪। উপভাষা প্রধানত অঞ্চল-বিশেষে মানুষের মুখের ভাষা— দৈনন্দিন জীবন যাপনের ভাষা।

৫। তবে 'উপভাষায় কোনো ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ দোষ বা ভুল প্রয়োগ টিকতে পারে না।'

৬। এ পর্যন্ত দেখছি, উপভাষা ব্যবহারকারী মানুষেরা বৃহত্তর কারণে—(ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক) লেখার সময়, বা বিশেষ স্থানে বক্তৃতার সময় উপভাষা পরিত্যাগ করে আদর্শ ভাষাটিকেই ব্যবহার করে। যেমন— স্কুলে বা অফিসে দরখাস্ত লেখার সময় বা দূরস্থিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে চিঠি পত্র আদানপ্রদানে।

৭। সম্প্রতি, আঞ্চলিক উপভাষাতেও সাহিত্য লেখা হচ্ছে। আঞ্চলিক উপভাষার লোকগানগুলি খুব জমে উঠছে। কিছু দিন আগেও কোনো কোনো চরিত্রের মুখেও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। এখন উপভাষাকে ভিত্তিকরে বহু সাহিত্য লেখা হয়েছে।

৮। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই উপভাষা আছে।

৯। উপভাষায় রচিত প্রাচীন মৌখিকসাহিত্যকে সাধারণত 'লোক-সাহিত্য' বলে।

১০। উপভাষার শব্দাবলী থেকে অনেক ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক মূল্যায়ন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

১১। উপভাষার মধ্যেই ভাষার যথার্থ প্রাণশক্তি নিহিত। ম্যাকস্‌মুলারের ভাষায় : 'The real and natural life of a language is its dialects'.

□ দুই □ বাংলা ভাষার উপভাষা বিভাগ

বাংলা ভাষার উপভাষা প্রধানত পাঁচটি—

১. রাঢ়ী
২. ঝাড়খণ্ডী
৩. বরেন্দ্রী
৪. বঙ্গালী
৫. কামরূপী বা রাজবংশী ॥

□ তিন □ ১॥ 'রাঢ়ী উপভাষা'[১]

(ক) Area বা এলাকা :

'রাঢ়ী উপভাষা' প্রধানত পশ্চিম বাংলার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত।

(খ) বিস্তারগত সূক্ষ্মবিভাগ :

বাংলা ভাষার উপভাষা গুলির মধ্যে রাঢ়ীর বিস্তার সর্বাধিক। সেজন্যে রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—'পূর্ব বাঁকুড়া'র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, 'হাওড়া'র লোকেরা সেভাবে বলে না। আবার 'হুগলী'র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, 'দক্ষিণ ২৪-পরগণা'র লোকেরা সেভাবে কথা বলে না। তাই রাঢ়ী উপভাষাকেও কেউ কেউ চারভাগে ভাগ করতে চান :

অ। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান (পূর্ব), হাওড়ায় প্রচলিত কথ্য ভাষা।
আ। পশ্চিম রাঢ়ী—বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানে (পশ্চিম) প্রচলিত কথ্য।
ই। উত্তর রাঢ়ী— নদীয়া, মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কথ্য।
ঈ। দক্ষিণ রাঢ়ী— দক্ষিণ পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রচলিত কথ্য।

আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও বিভাগ নির্দেশ করেছেন।
কেউ কেউ 'পূর্ব রাঢ়ী' ও 'পশ্চিম-রাঢ়ী' নামেও দুটিবিভাগ করেছেন।[২]

(গ) রাঢ়ী উপভাষার উদাহরণ :

আদর্শ রাঢ়ী : হতভাগা ছেলে! তোকে কখন বলেছি— গাইটা দুইয়ে নিয়ে বাজারে যা। ও ছেলের কথা শোনে, বলে কি না, শীত করছে। ঘাড়টা ধরে নিয়ে আসবো। মারবো গালে চড়।

পশ্চিম রাঢ়ী : হতভাগা ছেলা! তুখে কখন বলেছি, গাইটাকে দুয়ে নিয়ে বাজারে যা। ত ছেলা কুন্থ কথা শুনবেক নাই। বলছে, জাড়াচ্ছে বটে। ঘাড় ধরো লিয়ে আইসব। গালে চড়ই দিব।

রাঢ়ী উপভাষাই আদর্শ বাংলাভাষার উৎস স্থল। আজকে সারা বাংলায় যে-ভাষা 'আদর্শ' রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা এই রাঢ়ী উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

---

১. বাঁকুড়া'র উপভাষা—দ্রি. চৌ. কা.
২. রাঢ়ের জনদেবতা (ব. বি. ১৯৮৯)— দ্রি. চৌ. কা.। রাঢ় পরিচিতি

(ঘ) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Phonological features) :

১. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—'অ' স্থলে 'ও' উচ্চারণ। যেমন :
হল > হলো। মত > মতো। বড় > বড়ো। অতুল > ওতুল। অজিত > ওজিত। মধু > মোধু। তথ্য > তথ্যো। পাগল > পাগোল। মন > মোন। প্রমাণ > প্রোমাণ। বন > বোন (জঙ্গল)।

২. রাঢ়ী উপভাষার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— 'অভিশ্রুতি'। অর্থাৎ শব্দ মধ্যে অপিনিহিতের 'ই' বা 'উ' ধ্বনি লোপপাবে ; অথবা ই, উ অন্য স্বরের প্রভাবে লোপ পাবে, অথবা অন্য স্বরের সঙ্গে মিশে নতুন রূপ পাবে— সেই হল অভিশ্রুতি।
যেমন : করিয়া > কইর্যা > করে, চারি > চাইর > চার, বহিন > বইন > বোন,

৩. রাঢ়ী উপভাষায় পদের আদিতে শ্বাসাঘাত প্রবণতা আছে এবং তারই ফলে পদের মধ্যবর্তী ও অন্তঃস্থিত মহাপ্রাণবর্ণ[১] অল্পপ্রাণবর্ণে[২] পরিণত হয়। যেমন :
দুধ > দুদ, বাঘ > বাগ।

৪. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দান্তস্থিত অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :
কাক > কাগ, ছাত > ছাদ, উপকার > উবগার।

৫. রাঢ়ী উপভাষায় নাসিক্যীভবন ও স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন :
পুস্তিকা > পুত্থিআ > পুথি— পুঁথি। সূচ > ছুঁচ, পেচক > পেঁচা।
ইষ্টক > ইট— ইঁট। তেমনি—চাঁদ (< চন্দ্র), বাঁশ, আঁটা, চাঁক।
বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রচুর অনুনাসিকের আগম— চাঁ হঁয়েছে না কি হঁ। (= চা হয়েছে কি, ওহে)। ফুঁটাই মরে যাঁবি (= দেহ ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ হয়ে মারা যাবি)।

৬. রাঢ়ী উপভাষায় অনেকসময়ই ন > ল, ল > ন হয়। যেমন :
ন > ল— নৌকা > লৌকা, নয় > লয়, নড়া > লড়া।
ল > ন— লংকা > নংকা, লুচি > নুচি, লোহা > নুয়া (নোয়া), লেবু > নেবু, লাউ > নাউ, লবন > নুন, গুলো > গুনো।

৭. রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় শব্দ মধ্যস্থ পাশাপাশি অবস্থিত বিষমধ্বনির সমধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন :
বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি।

৮. রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় 'হ' কার লোপ পায়। যেমন :
তাহার > তার, কহি > কই, দহ > দ।

দুই॥ রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রাঢ়ী উপভাষার রূপতত্ত্বগত নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান :

---

১. মহাপ্রাণবর্ণ = বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ = খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ;
২. অল্পপ্রাণবর্ণ = বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ = ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব।
৩. অঘোষ ধ্বনি = বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ = ক, খ; চ, ছ; ট, ঠ; ত, থ; প, ফ।
৪. ঘোষ ধ্বনি = বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ = গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম।

১। রাঢ়ী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে 'গুলি', 'গুলা', 'গুলো' এবং অন্যান্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন :

গুলি, গুলা, গুলো— ছেলেগুলি, মেয়েগুলা, পাখিগুলো। ছেলেগুলি ভাতখায়।

দের— আমাদের, তাদের, রাখেদের, পাখিদের, তোদের।

তোদের দিয়ে কাজটা হবে (করণ কারকে)।

আমাদের খেতে দাও (কর্মকারকে)।

২। রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'এ' বা 'তে' বা 'এতে' বিভক্তির যোগ হয়। যেমন :

এ— ঘরে এসো। বনে গাছ নেই। জলে মাছ আছে। দেশে দেশে মোর ঘর আছে।

তে— বাড়িতে এসো। বাঁকুড়াতে দেখে এলাম।

এতে— ঘরেতে ভাত নেই। জলেতে মাছ আছে।

৩। রাঢ়ী উপভাষায় মুখ্য-কর্মে[1] কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গৌণকর্মে[2] 'কে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—

শিক্ষকমশায় ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।

—এখানে মুখ্য কর্ম— 'ব্যাকরণ' : 'ব্যাকরণে' কোনো বিভক্তি নেই।

—এখানে গৌণকর্ম— 'ছাত্রদেরকে' : ছাত্রদেরকে' শব্দে 'কে' বিভক্তি যোগ হয়েছে।

অন্য উদাহরণ :

(ক) ছেলেটাকে (গৌণকর্ম) একটা বল্ (মুখ্য কর্ম) দাও।

(খ) তোমাকে (গৌণকর্ম) গান (মুখ্যকর্ম) শোনাবো।

(গ) বাবা, আমাকে (গৌণকর্ম) একবার বাড়ি (মুখ্যকর্ম) লইয়া যাও।

৪। রাঢ়ী উপভাষায় কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি নিম্নরূপ :

(ক) বর্তমান কালে

উত্তম পুরুষে— 'ই' বিভক্তি	:	আমি গান করি। আমরা আসি।
মধ্যম পুরুষে— 'অ', 'ও', 'ইস্'	:	তুমি গান কর। তোমরা এসো। তুই আসিস্।
প্রথম পুরুষে— 'এ', 'এন'	:	সে গান করে। তিনি আসেন।

(খ) অতীত কালে :

উত্তম পুরুষে— উম, আম বিভক্তি	:	আমি গান করলুম। গান গেয়েছিলুম। গেয়েছিলাম।
মধ্যম পুরুষে— এ, এন, ই বিভক্তি	:	তুমি গান করেছিলে। আপনি গেয়েছিলেন। তুই গেয়েছিলি।
প্রথম পুরুষে— অ, এন বিভক্তি	:	সে গান করেছিল। তিনি গেয়েছিলেন।

(গ) ভবিষ্যৎ কালে

উত্তম পুরুষে— ব, বো, ও	:	আমি গান করবো। আমরা গাবো।
মধ্যম পুরুষে— বে, বেন, বি	:	তুমি গান করবে। আপনি গান করবেন। তুই গান করবি।
প্রথম পুরুষে— বে, বেন	:	সে গান করবে। তিনি গান করবেন।

১. মুখ্য কর্ম : সকর্মক ক্রিয়াকে 'কী' প্রশ্নের উত্তরে যা পাই, তা-ই মুখ্যকর্ম।

২. গৌণকর্ম : সকর্মক ক্রিয়াকে 'কাকে' প্রশ্নের উত্তরে যা পাই, তা-ই গৌণ কর্ম।

৫। যৌগিক ক্রিয়া গঠনের পদ্ধতি :

আচার্য সুকুমার সেন বলেন, রাঢ়ীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে (ই) অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া অসম্পন্ন কালের এবং (ইয়া) অন্ত অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠিত হয়।

যেমন : করিয়াছে > করেছে, করিতেছিল > করছিল, করিয়াছে > করেছে, করিয়াছিল > করেছিল ॥

তিন ॥ ২ ॥ 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা

'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া ও সিংভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'ঝাড়খণ্ডী' নামটি দিয়েছেন সুকুমার সেন। উল্লিখিত অঞ্চলটি এমন ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে 'জঙ্গল মহল' নামেও পরিচিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে 'ঝারিখণ্ড'। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থানে 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' বিস্তৃত বলে জানিয়েছেন।

(খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উদাহরণ :

অ দিদি, চিনাই দে ন কে বটে লকটি।

অ বিষ্টুপুরের হলদ মাখে গা করেছে আল।

অ বহিন, নায়র কুলহিতে মাদল বাজে

পান চিবাই চিবাই উটা ঘুরেঁ মরছে ভাল।। অ দিদি গ ...

আদর্শ বাংলায় রূপান্তর :

ওগো দিদি, লোকটি কে বটে, আমাকে চিনিয়ে দাও। লোকটি বিষ্ণুপুরের হলুদ মেখে গা টি আলোর মতো উজ্জ্বল করেছে। ওগো বোন, নায়েরগুলিতে মাদল বাজছে। লোকটি পান চিবিয়ে চিবিয়ে সানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(গ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগ।

যেমন : আটা > আঁটা, বাসা > বাঁসা। চা > চাঁ। গরুড় > গঁড়ুর। ঘড়া > ঘঁড়া। কুয়ো > কুঁই। জটা > জঁটা। দেশজ / আঞ্চলিক শব্দে অনুনাসিকতা: কঁকা (বোবা)। কঁচড় (কোমর)। আঁড় (কাঠের দরজা)। চেঁদড় (বদরাগী)।

২. ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে প্রায় সবত্রই 'ও'-কার লোপ পেয়ে 'অ' কারে পরিণত হয়েছে।

যেমন : লোক > লক, গোয়াল > গয়াল, মোটা > মটা, রোগা > রগা, ঘোড়া > ঘড়া। অশোক > অশক। আলো > আল।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন : দূর > ধূর। কাঁকড়া > খাঁকড়া। তোকে > তখে। পতাকা > ফতকা। কাঠি > খাড়ি। নিতাম > ভিথম।

৪. ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে 'ল' ও 'ন' এবং 'ব' ও 'ম' বিপর্যস্ত হয়েছে।
যেমন : নাতি > লাতি। লাল > নাল। নাচনী > লাচনী। যমুনা > যবুনা। রামায়ণ > রাবায়ণ।

৫. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় মহাপ্রাণতার নবতর বৈশিষ্ট্য হলো :— 'হ্', 'ম্হ', 'ল্হ', 'র্হ' কিংবা 'ঢ' প্রভৃতির বিশিষ্ট ব্যবহার।
যেমন : কুমার > কুম্হার। কুমীর > কুম্হীর। কুলি > কুল্হি। পালা > পাল্হা। জোড়া > জোড়হা। গেড়ি > গেঢ়হি। কাল্হা (ঠাণ্ডা অর্থে)। চুল্হা (উনুন অর্থে)।

৬. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই।
যেমন : ধুলা > ধুলা। শিয়াল > শিয়াল।

৭. অব্যয়ে 'গা', 'গিলা'র প্রয়োগ। যেমন : গরুগিলা ভড়ৰাই দে। কাহিনগাকে যাত্যে বল্। ছঁড়াগা মরে নাইখ।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ক্রিয়াপদে সার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার :
যেমন—যাবেক নাই। মরবেক। করবেক।

২। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় নাম-ধাতুর প্রচুর ব্যবহার :
যেমন— জাড়াচ্ছে। সিদহিছিল। মেঘ বিজলাচ্ছে। ভোকে খাবলাই মরছে। হড়বড়াই যাচ্ছে। চটাই দিব। পথরের জলটা গঁধাচ্ছে।

৩। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট' ধাতুর প্রয়োগ :
যেমন— উ টা হুঁড়ার বটে। কে বটে লক টি। বিটি বটে ন।

৪। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় বিভক্তির প্রয়োগ নিম্নরূপ :
(ক) কর্মে ও সম্প্রদান কারকে 'কে' বিভক্তি— জলকে গেছে, ঘরকে চল।
(খ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হল— 'লে', 'নু'। যেমন : মায়ের লে মাসীর দরদ। বাঁশের নু কঞ্চি বড়। বেকারের নু বেগার ভাল।
(গ) অধিকরণে 'কে', 'এ' বিভক্তি। যেমন : কে = রাইতকে বড় জাড়াবেক। কব্‌কে যাবি গ। পাঁকে আল সুক শাঁকা। এ = সিতাএ সিঁদুর দে। কুলহিএ কেউ নাইখ। গাড়এ জল বটে ॥

তিন॥ ৩॥ 'বরেন্দ্রী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা

'বরেন্দ্রী উপভাষা' উত্তর বঙ্গে প্রচলিত। প্রধানত মালদহ, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলার লোকমুখের ভাষাকেই 'বরেন্দ্রী উপভাষা' বলে।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন : একদা রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী একই উপভাষা ছিল। পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 'বঙ্গালী' ও বিহার থেকে আগত 'বিহারী' উপভাষার নানা প্রভাব পড়ে মালদহ প্রভৃতি স্থানের মৌখিকভাষা একটি স্বতন্ত্র উপভাষা রূপে পরিগণিত হয়। তারই নাম 'বরেন্দ্রী'।

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার উদাহরণ :

মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত—
হতভাগা ছুয়া। হামি কহনু এ্যাকনা গাতজা দুয়ার দিয়ে হাটিত যা। উকি শুনছে? উ কয়ছে, জ্বর লাগছে। পর্মানটা বরা ওয়াক্ দিয়ে আহ। পালায় চর উঠিনু।

(গ) বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় ঠিক রাঢ়ী মতোই আনুনাসিক স্বরধ্বনি আছে।
যেমন— কাঁটা, চাঁদ, হাঁট, পুঁথি, ছুঁচ, পেঁচা।

২. বরেন্দ্রী উপভাষায় স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে এ > এ্যা হয়।
যেমন— দ্যাল, দিল্যাল, এ্যাক, দ্যাক, দ্যাও।

৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় কেবলমাত্র শব্দের আদিতে সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে সেগুলি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়।
যেমন— বাঘ > বাগ।

৪. বরেন্দ্রী উপভাষায় বঙ্গালীর মতো জ > জ (z) রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন—জল > ঝল (zal), কালী পূজা > খালিফুজা। কাগজ > খাগজ।

৫. বরেন্দ্রী উপভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপ্রত্যাশিত স্থানে 'র' এর আগম বা লোপ।
যেমন :
(ক) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' নেই, সেখানে 'র' এসে যায়— আম > রাম।
(খ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' আছে, তা আকস্মিক উচ্চারণে লোপ পায় ও 'অ' উচ্চারিত হয়— রস > অস।
উদাহরণ— রামবাবুর আমবাগান > আমবাবুর রামবাগান।
আমের রস > রামের অস।

৬. বরেন্দ্রী উপভাষায় শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। বরেন্দ্রী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে 'গুলি', 'গিলা', এবং অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : বান্দরগিলা। মাইয়াদের।

২। বরেন্দ্রী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'ত্' বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়।
যেমন : মনে > মনত্; বুকে > বুকত্; বাড়িতে > বাড়িত্
(বাইগন বাড়ীত্ উডাও সার)

৩। বরেন্দ্রী উপভাষায় অতীত কালের উত্তম পুরুষে 'লাম'; ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে 'মু', 'ম' বিভক্তি দেখাযায়।
যেমন : 'ভলা গাড়লাম সারি সারিয়ে'; 'আর কতয়কাল রাখিম ভালিম চোরক দিয়া ফাকি'; 'মুই নারী কামনে দিমু পারি রে।'

৪। বরেন্দ্রী উপভাষাতে গৌণ কর্মে 'কে', 'ক' বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : 'হামাক দাও'; 'অবোদ একটা পাগোলক্ ধরিয়া' ॥

তিন॥ ৪॥ 'বঙ্গালী উপভাষা'

ক) Area বা এলাকা

'বঙ্গালী উপভাষা' রাঢ়ী উপভাষার মতোই বিস্তার লাভ করেছে। পূর্ববাংলার এটি প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে 'বঙ্গালী উপভাষা' প্রচলিত।

তবুও মনে রাখতে হবে, এই সব জেলা গুলির মধ্যে লোকমুখের উচ্চারণে আরও অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

খ) বঙ্গালী উপভাষার উদাহরণ (ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত)

হুইকরুপইলা পোলারে। কি আর কমু? কোন্ হাত হাকালে কইচি— গরুডারে পানাইয়া রাক্কারে বা। এহুন পোলা! তা নি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরচে। ল্যাক্, যাড়তা ধইরা টৈনা অনু, মাকম গলে ধাপর।

গ) বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির সার্বিক প্রয়োগ। সাধারণ শব্দে তো বটেই, 'ক্ষ', 'ক্ষ', 'জ্ঞ', বা 'য'-ফলা যুক্ত শব্দেও অপিনিহিতি বর্তমান।
   যেমন : করিয়া > কইর‍্যা; ধরিয়া > ধইর‍্যা; আজি > আইজ; লক্ষ > লইক্‌খ; ব্রাহ্ম > ব্রাইম্ম; যজ্ঞ > যইগ্গ।

২. বঙ্গালী উপভাষায় সংবৃত 'এ' > বিবৃত 'এ্যা'।
   যেমন : কেশ > ক্যাশ; তেল > ত্যাল; দেশ > দ্যাশ; কেন > ক্যান।

৩. বঙ্গালী উপভাষার 'র' ও 'ড়' এর প্রচণ্ড বিপর্যয়। অর্থাৎ এই উপভাষীরা 'ড়' কে 'র' এবং 'র' কে 'ড়' উচ্চারণ করে।
   যেমন : তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো > তারাতারি বারি আইসো। চার > চাড়, করি > কড়ি। ঘোড়ার গাড়ি > ঘোরার গারি। ঘরভাড়া > ঘড় ভারা।

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় 'ও' > 'উ' উচ্চারিত হয়।
   যেমন : কোদাল > কুদ্যাল; কোপ > কুপ; দোষ > দুষ। কোট > কুট।

৫. বঙ্গালী উপভাষাতে 'শ' এবং 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়।
   যেমন : শালা > হালা; শাক > হাগ; সকল > হগল; বসো > বহো।

৬. বঙ্গালী উপভাষায় 'চ' > 'ৎস্', 'ছ' > 'স্' এবং 'জ' > 'জ' (z) উচ্চারিত হয়।
   যেমন : চাঁদু > চা (ৎসা) দু; খেয়েছে > খাইসে; জ্ঞান দিলাম > জান (zan) দিমু।

৭. বঙ্গালী উপভাষাতে শব্দের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত 'হ',—'অ' রূপে উচ্চারিত হয়।
   যেমন : হতভাগা > অতোভাগা; হয় > অয়।

৮. বঙ্গালী উপভাষায় অনেক সময় শব্দের মধ্যস্থিত ট, ঠ— 'ড' তে রূপান্তরিত হয়।
   যেমন : দুইটি মিঠা পান দিলাম > দুইডি মিডা পান দিমু; এটা সেটা > ইডা- সিডা।

৯. বঙ্গালীতে অনেক সময় 'ল' > 'ন' লক্ষ্য করা যায়।
   যেমন : 'লক্ষ্মীপূজার নাড়ু' > 'নক্‌খী পূজার নাড়ু'। লাউ > নাউ; লোভ > নোভ।

১০. বঙ্গালীতে অস্থানে আনুনাসিক আসে না— বস্থানেও অনুনাসিক লোপ পায়।
   যেমন : চাঁদ > চাদ। কাঁদা > কাদা। বাঁধন > বাধন।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

১। বঙ্গালী উপভাষায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে।
   যেমন : নবীন আসে > নবীনে আইসে। আপনি ঠিকই বলেছেন > আপনে ঠিকই কইছেন। না হলে মানুষ বিশ্বাস করে না > না হইলে মাইনষে বিশ্বাস করে না।

২। বঙ্গালী উপভাষায় গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি হয়।
   যেমন : আমারে মারে ক্যান, 'তারে খাইসে দাও'।

৩। কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য সব কারকে বহু বচনে 'রা', (রার) গো (গোর) বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : 'আমরার', 'আমাগোর', আমাগো, তোমাগো।

৪। অধিকরণকারকে 'এ', 'তে', 'ত' বিভক্তি যোগ হয়।
   যেমন : পানিতে ভিজাও, 'জলে ডুইব্যা মর', 'খরিৎ কত্তা বাজে'।

৫। বঙ্গালীতে করণকারকে 'এ' বিভক্তি তো আছেই। এছাড়া 'দিয়া', 'লগে', 'সঙ্গে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার।
   যেমন : তোরে দিয়া কাজ হবা না।

৬। বঙ্গালী উপভাষাতে অপাদান কারকে 'ত', 'তনে', 'তোন' এবং 'থন', 'থনে', 'থুন' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার আছে।

৭। অতীত কালে (ক) উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'আম্'—তার কথা হুমি শুনতাম্ (শুনলাম)।
   (খ) মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'লা'। যেমন : আমগোর কি করলা।

৮। বঙ্গালী উপভাষাতে ভবিষ্যৎকালের উত্তমপুরুষের বিভক্তি 'ম', মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'বা' এবং প্রথম পুরুষের বিভক্তি 'ব'। যেমন :

> 'কোথায় পাইবাম কলসি কইনা।'
> 'তুমি তার কুনু কতা বুঝ্‌বা না।'
> 'তাহারে দিয়া এ কাম চল্‌বা না।'

৯। বঙ্গালী উপভাষায় যৌগিকক্রিয়াপদে 'ই' অন্ত অসমাপিকাক্রিয়া দিয়ে সম্পন্নকাল গঠন। যেমন : করিয়াছি > করসি, করতে আছি।

১০। বঙ্গালী উপভাষায় 'ইতে' অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে অসম্পন্ন কাল গঠন।
   যেমন : করিতেছি > কইরত্যাছি।

১১। বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশ।
   যেমন : দুই ছালা কোবাকুবি কইর‍্যা মরে। মায়ে ডাকে।।

তিন॥ ৫॥ 'কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা :

'কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা' প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, কাছাড়, রংপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত।

এই উপভাষা অনেকটা বরেন্দ্রী ও অনেকটা বঙ্গালীর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কারো কারো ধারণা কামরূপী হলো কামরূপের নিকটবর্তী উপভাষা, তা 'বঙ্গালী'র রূপভেদ মাত্র।

আবার কেউ কেউ মনে করেন—কামরূপীর পূর্বদিকের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই অসমীয়া ভাষা গড়ে উঠেছে।

(খ) কামরূপী উপভাষার নিদর্শন :

তুই কোটে যাইস?
মুই কইল্কাতা যাবার ধরিছং।
কইল্কাতা এক আজব শহর। পৃথিবীর সগল দেশের মানুষি সেটে দেখির পাবু।
আসুং কুন দিন?
বছর ডেরেক পাতে।
চিনির পাবুতো? সেদিন কিছ গোটায় বলছি না যাইস। আমার শুনার কতাও মাঝে মাঝে মানত করবু।

(গ) কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

(১) কামরূপী উপভাষায় বরেন্দ্রীর মতো অপিনিহিতি আছে, তবে তুলনায় কম। যথা : আজি > আইজ।
(২) কামরূপী উপভাষায় বঙ্গালীর মতই 'র' এবং 'ড়'-এর বিপর্যয় ঘটে। যেমন : শাড়ী পরে বাড়ি যাব।> সারি পইর‍্যা বারি যামু।
(৩) কামরূপী উপভাষাতে বঙ্গালীর মতোই চ > ts, ছ > স; জ > দ, জ (Dz), ঝ > z হয়।
(৪) কামরূপী উপভাষাতে অনেক সময় 'ন' ও 'ল' -এর বিপর্যয় ঘটছে। যেমন—লাঙল > নাঙল, লাল > নাল। অপর পক্ষে— জননী > জলনী, নিলাম > লিলাম।
(৫) কামরূপী উপভাষায় পদের আদিতে মহাপ্রাণব্যঞ্জন বজায় থাকে। কিন্তু পদের মাঝে বা শেষে থাকলে, তা অল্পপ্রাণে পরিণত হয়।
(৬) কামরূপী উপভাষায় 'শ', 'ষ', 'স' সবই 'শ' উচ্চারিত হয়।
(৭) কামরূপীতে শব্দের 'অ' শ্বাসাঘাতের জন্য 'আ' উচ্চারিত হয়। যেমন— অতি > আতি; অসুখ > আসুখ; কথা > কাথা।
(৮) কামরূপীতে কখনো কখনো 'ও' > 'উ' হয়। যেমন— কোন > কুন, বোন > বুন।
(৯) কামরূপী উপভাষায় অনেক সময় স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা দেখা যায়। যেমন— ইহা > ইঁয়া; উহা > উঁয়া।
(১০) কামরূপীতে কখনো কখনো শব্দের আদিস্থিত 'র' ধ্বনি বর্জিত হয় এবং 'অ' ধ্বনি রক্ষিত হয়। যেমন : রাতি > আতি; রাগ > আগ; রাক্ষস > অক্ষশ।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। কামরূপী উপভাষাতে মুখ্যকর্মে ও গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : আমাকে ভাত দাও > হামাক বাত দাও।
২। কামরূপী উপভাষাতে অধিকরণে 'ত' এবং অপাদানে 'থাকি' অনুসর্গ যোগ হয়। যেমন : 'ঘরত যামু'। 'পাছত'। 'ঘর থাকি'।

৩। কামরূপী উপভাষাতে পুরুষভেদে সর্বনামের নিম্নোক্ত রূপ লক্ষ্য করি :
(ক) উত্তম পুরুষে 'মুই'—আমরা।
(খ) মধ্যম পুরুষে 'তুই'—তোমরা।
৪। কামরূপী উপভাষাতে মধ্যম পুরুষের অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালে 'উ' বিভক্তি যোগ হয়।, যেমন : 'তুই করলু', 'তুই করবু'।
৫। কামরূপী উপভাষাতে 'ই' প্রত্যয় দেখিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : দেখি, পাই।
৬। কামরূপীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে খোয়া ধাতুর ব্যবহার আছে। যেমন— রাগ করা > 'আগ খোয়া'; মনে লাগা > 'মনত খোয়া'।
৭। কামরূপীতে ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখাযায়। (এ বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতেও আছে। যেমন : 'না জাও'; 'না দেখিম্' ॥

□ চার □ রাঢ়ী ও বাঙ্গালী উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা।

রাঢ়ী উপভাষা	বঙ্গালী উপভাষা
ভূমিকা	
১. 'রাঢ়ী' বাংলা-ভাষার একটি প্রধান উপভাষা। ২. প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত বলেই এর নাম 'রাঢ়ী' উপভাষা। ৩. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান এলাকা হলো—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও মর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ৪. রাঢ়ী উপভাষার একটি উদাহরণ : পূর্ব বাঁকুড়ায়—হতভাগা ছেল্যা! তুখে কখন বল্যেছি গরুটাক দুয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেল্যা কন কথা শুনব্যাক নাই। বল্ছে, জাড়াচ্ছে বটে। ঘাড় ধর‍্যে নিয়ে আসবো। গালে চড়াই দিব।	১. 'বঙ্গালী'ও বাংলা-ভাষার একটি প্রধান উপভাষা। ২. প্রধানত বঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বলেই এর নাম 'বঙ্গালী' উপভাষা। ৩. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান এলাকা হলো—পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি ও কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ৪. বঙ্গালী উপভাষার একটি উদাহরণ : ঢাকা অঞ্চলে— ছাইক্কপাইলা পোলারে! কি আর কমু? কোন্ হাত হকালে কইচি— গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমুন পোলার পোলা! অ নি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্, ঘাড়ডা ধইরা লৈয়া আমু, মারুম গালে থাপর।
ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	
১. 'ই', 'উ', 'ঋ', য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-কার 'ও'-কারে পরিণত হয়। যেমন—অতি > ওতি; মধু > মোধ; লক্ষ > লোক্খো, সত্য > সত্তো।	১. 'য'-ফলা, 'ক্ষ', 'জ্ঞ'-এর ক্ষেত্রে 'ই'-কার এর আগম ঘটে। যেমন—সত্য > সইত্য; বাক্য > বাইক্য; রাক্ষ > রাইক্ষ, রাক্ষস > রাইকস, যজ্ঞ > যইগগ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রাঢ়ী উপভাষা	বঙ্গালী উপভাষা
২. রাঢ়ী উপভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন— দেশি > দিশি; বিলাতি > বিলিতি; করিয়া > করে।	২. বঙ্গালী উপভাষায় অপিনিতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন— করিয়া > কইর‍্যা; রাখিয়া > রাইখ্যা।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় অনুনাসিক স্বরের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পুথি > পুঁথি।	৩. বঙ্গালী উপভাষায় অনুনাসিক স্বর নেই বললেই চলে। স্বস্থানে অনুনাসিকও উঠে গেছে। যেমন— চাঁদ > চাদ।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দের আদি ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত থাকায় পদান্ত ব্যঞ্জনে মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন— দুধ > দুদ। মাছ > মাচ। হঠাৎ > হটাৎ।	৪. বঙ্গালী উপভাষায় সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন— ভাত > বাত; ঘা > গা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— আমাদের বই দাও।	১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'গো' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— হামাগো, তোমাগো।
২. গৌণকর্ম সম্প্রদানে ও অধিকারণে 'কে' ও 'তে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন— 'আমি রামকে টাকা দিয়েছি'। 'কাকে বলব?' 'ঘরেতে এলো না সে।'	২. বঙ্গালী উপভাষাতে গৌণকর্ম সম্প্রদানে ও অধিকরণকারকে 'রে', 'তো' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন— 'রামেরে কৈসি'; বাড়িতো থাকুম'।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় সামান্য অতীতে প্রথম পুরুষে অকর্মক ক্রিয়াপদে 'ল' বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিয়াপদে 'লে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— সে গেল, সে দিলে।	৩. বঙ্গালী উপভাষায় সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'লাম'। যেমন— আমি চললাম, আমি বললাম।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় উত্তম পুরুষের পদ গঠনে 'লুম', 'নু' বিভক্তি যেমন—আমি বললুম', 'লাম', 'নু' বিভক্তি যেমন—আমি বললুম, আমরা বললাম। আমরা গেনু।	৪. বঙ্গালী উপভাষায় উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতে, 'উম্' বা 'মু' বিভক্ত যুক্ত হয়। যেমন— 'আমি খেলুম না', 'আমি যামু'।
৫. রাঢ়ী উপভাষায় উত্তম পুরুষের পদগঠনের ক্ষেত্রে 'আছ্' ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষবিভক্তি যোগ করে ঘটমান ও পুরাঘটিত অতীতের রূপ গঠন করে। যেমন—কর্ + ছি > করছি; কর + ছিল > করছিল॥	৫. বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশিত হয়। যেমন— মায়ে ডাকে (মা ডাকছে)॥